দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ১৭ এপ্রিল, ২০২৩।। ৩ বৈশাখ - ১৪৩০।।
যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

শোভাযাত্রায় আক্রমণ অশান্ত পশ্চিমবঙ্গ

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ৩ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৭ এপ্রিল - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মমতা রাজা সেজেছেন কিন্তু সিংহাসনে বসতে শেখেননি □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

একেই বলে প্রায়শ্চিত্ত—বাংলার মেয়ে শুধু বাংলার □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ভারতীয়রা বিশ্বের সুখীতম মানুষ □ চেতন ভগত □ ৮

রেখো না মা কেবল বাঙ্গালি করে □ সুব্রত দত্ত □ ১০

রিষড়া ও শিবপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলার ঘটনা হিন্দু সমাজের চোখ খুলে দিয়েছে □ আনন্দ মোহন দাস □ ১১

সরকার চায় বলেই পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হয় □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৩

সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক মজবুত করতেই শাসকের দাঙ্গার চক্রান্ত □ হীরক কর □ ১৫

হাওড়ায় আক্রান্ত রামনবমীর শোভাযাত্রা □ সঞ্জয় মুখার্জি □ ২৩

সাক্ষাৎকার : প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েই হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল—ইন্দ্রজিৎ দুবে □ ২৪

রামনবমীতে আক্রমণ হয় কারণ তা মোল্লাবাদের পরিপন্থী □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৬

মহাজনের পথই ধর্মের পথ □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

সর্বরোগহর একাদশী ব্রতের উপকারিতা □ অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ □ ৩৪

প্রাচীন বঙ্গদেশের জনগোষ্ঠী □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩৫

ত্রিপুরায় বিজেপির ঐতিহাসিক জয় কুচক্রীদের মুখের মতো জবাব দিয়েছেন ত্রিপুরাবাসী □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ৩৬

পাকিস্তানে বিপর্যয়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ৩৮

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায় □ সনাতন বিদ্যার্থী □ ৪৩

চিঠিপত্র : ১৯ □ অঙ্গনা : ২০ □ সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৪ এপ্রিল
২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৪ এপ্রিল
২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে জনজাতি সমাজের সম্মান

সম্প্রতি চারজন জনজাতি মহিলা দণ্ডী কেটে তৃণমূল কংগ্রেসে ঘরওয়াপসি করেছেন। এরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ওই চারজনকে দণ্ডী কাটার বিধান দেয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। নেতাদের দাবি, প্রায়শ্চিত্ত করেই নাকি দলে ফিরতে হবে। যদিও অর্জুন সিং, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল রায়, কুণাল ঘোষ— কাউকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি। ওরা চারজন মহিলা জনজাতি সমাজের বলেই কি এই শাস্তি? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় এটাই।

লিখবেন— বিমল শঙ্কর নন্দ, রক্তিম দাশ প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংখ্যালঘু ভোটের জন্য হিন্দু নিগ্রহ

স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালোভী শাসকগোষ্ঠী শাসন ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য কী-ই না করিতে পারে; ইংরাজ এই দেশের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া মুসলমানদিগকেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে উসকাইয়া দিয়াছিল। তাহাদের অন্যায় অত্যাচার ও দাবির পরিণামে দেশমাতৃকা পর্যন্ত খণ্ডিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলামি শাসনকালকে মধ্যযুগ বা অন্ধকার যুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে সিন্ধুরাজ্য ভারতবর্ষের সবচাইতে শক্তিশালী রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। আরব দস্যুরা সর্বপ্রথম সিন্ধুরাজ্য দখল করিয়াছিল। তাহার পরে তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করিবার উদ্দেশ্যে পির ও দরবেশ প্রেরণ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারাই ভারতবর্ষে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। এই পঞ্চম বাহিনীর সহায়তায় আরব দস্যুরা এই দেশের হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়া ইসলামের অনুগামী করিয়া ফেলে। ভারতবর্ষে ইসলামের প্রাদুর্ভাব এবং তাহাদের রাজ্যবিস্তার লইয়া সবচাইতে নির্ভরযোগ্য তথ্য রহিয়াছে ফারসি ভাষায় লিখিত 'চাচনামা', 'ফতেহনামা' এবং 'তারিখ আল-হিন্দ ওয়া আস-সিন্ধ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থগুলিতে ভারতবর্ষে ইসলামি আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার ও নিষেধাজ্ঞার বিবরণ রহিয়াছে। ইসলামি শাসনকালে শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের হিন্দুরা যে নৃশংসতা, অত্যাচার ও হত্যার শিকার হইয়াছে তাহা অদ্যাবধি বহু শিক্ষিত হিন্দুও অবগত নহে অথবা কোনো স্বার্থের কারণে প্রকাশ করিতে চাহেন না।

দেশ স্বাধীন হইবার পরও দেশে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিতে হিন্দুদিগের উপর বিধর্মীদিগের অত্যাচার ও নৃশংসতা কিছুমাত্র কম হয় নাই। ধূর্ত ইংরাজদিগের ন্যায় দীর্ঘ কয়েক দশক কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা জেহাদি শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। ফলত বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দুদের ধর্ম-কর্ম ব্যাহত হইয়াছে। বাম আমলে এই রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার বামনাবাদে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিবার কারণে এলাকার সমাজসেবী জগদীশ সাহাকে বিধর্মীদের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সময় আরও ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। শাসক দলের প্রেরণায় হিন্দুদিগের স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করিবার অধিকারটুকুও মিলিতেছে না। বহু বিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজার অনুমতি দেওয়া হয় না। দুর্গাপূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রার অনুমতি পাওয়া যায় না। রাজধানী শহর কলকাতার বুকেও লক্ষ্মীপূজার দিন হিন্দুদের উপর বিধর্মীদের আক্রমণ নামিয়া আসে। কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশ্য দিবালোকে কলেজ স্ট্রিটে শীতলা পূজাস্থল আক্রমণ করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়াছে বিধর্মীরা। সম্প্রতি রামনবমীর শোভাযাত্রায় রাজ্যে কয়েক জায়গায় আক্রমণের ঘটনায় হিন্দুদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। মানুষ মনে করিতেছে, সরকার ও শাসকদলের উসকানিতেই এই আক্রমণ ঘটিয়াছে। প্রশাসনিক ইঙ্গিতেই রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ না করিয়া হিন্দুদের উপরই সমস্ত দোষ চাপাইতেছে। শাসক দলের কৃপাজীবী এক সংবাদপত্রও এই রাজ্যে রামনবমী উদ্‌যাপন ও শোভাযাত্রাকে 'উটকো বিপদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। হিন্দুদিগের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে কি পুনরায় ইসলামি শাসন চালু হইয়াছে? ইংরাজ ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট ভারতবর্ষে ইসলানি আক্রমণ ও শাসনের প্রক্রিয়াকে ইতিহাসের সবচাইতে রক্তাক্ত অধ্যায় বলিয়া চিহ্নিত করিলেও দাস মনোবৃত্তির রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত ঐতিহাসিকরা অদ্যাবধি তাহা হইতে কোনোরূপ শিক্ষাগ্রহণ করেন নাই। তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে তাহারা সবসময় হিন্দুদিগেরই দোষারোপ করিয়া থাকেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাই করিতেছেন। জেহাদি শক্তিকে তিনি হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছেন। ইতিহাস প্রমাণ, স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ করা জয়চাঁদেরও শিরচ্ছেদ করিয়াছিল মহম্মদ ঘোরি। আজ এই রাজ্যে জনসংখ্যার ভারসাম্য যেইভাবে বিঘ্নিত হইয়াছে এবং যেইভাবে শাসক দলের প্রশ্রয়ে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আক্রমণ হিন্দুদের উপর নামিয়া আসিয়াছে তাহাতে দেশবিভাগের সময়কার কথা স্মরণে আসিতেছে। সুখের বিষয় হইল, সেই বিপদের অগ্রিম আঁচ অনুভব করিয়া পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ সংগঠিত হইতে শুরু করিয়াছে। রাজ্য জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের রামনবমীর শোভাযাত্রায় শামিল হওয়া তাহাই প্রমাণ করিতেছে। মানুষের নিকট স্পষ্ট হইয়াছে যে ইসলামি আমলের পঞ্চমবাহিনীর কাজই করিতেছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। ইহারই প্রতিবিধানে রামনাম সম্বল করিয়া মানুষ পথে নামিয়াছে।

সুভাষিতম্

ন রাষ্ট্রং রাষ্ট্রতাং যাতি যদ্যসংঘটিতা জনাঃ।
নদানং রাষ্ট্রভাবস্য সুসংঘটিত জীবনম্।।

যে রাষ্ট্রে মানুষ সংগঠিত হয় না, সেই রাষ্ট্র ' রাষ্ট্রত্ব' প্রাপ্ত হয় না। সুসংগঠিত জীবনই রাষ্ট্রভাবের মূল ভিত্তি।

মমতা রাজা সেজেছেন কিন্তু সিংহাসনে বসতে শেখেননি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ রঙ্গা হরি স্বস্তিকার একটি সাম্প্রতিক লেখায় দেখিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (গুরুজী) কেন বলেছিলেন 'ধর্মান্তর থেকে রাষ্ট্রান্তর হওয়া উচিত নয়।' কারও পূর্বপুরুষ বদলায় না। তাঁর মতে রাষ্ট্রধর্ম, কুলধর্ম আর ব্যক্তিধর্ম সমস্ত জনতার অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের উন্নতি আর সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রধর্মই শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক ব্যক্তির উপাসনা পদ্ধতি তার ব্যক্তিগত। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় অস্মিতা কোনো পরিভাষার ধারণায় সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রীয় আত্মার কল্পনা যা কিনা পশ্চিমি জগতের কাছে অজানা। রাষ্ট্রীয় অস্মিতায় ভারতবর্ষ কীভাবে বিশ্বগুরু হয়ে উঠবে তার রূপরেখা তিনি তুলে ধরেছিলেন। হিন্দুদের বৈশ্বিক মিশন আর ভারতবর্ষের বৈশ্বিক কর্তব্য সমার্থক। 'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্' কীভাবে সমস্ত মানুষ আর সব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ে উঠবে সেটাই তিনি দেখিয়েছিলেন। তাঁকে পাথেয় করেই আমার এই লেখা। আচার্য চাণক্য বলতেন সামান্য আগুনের লোভে যে ব্যক্তি বা রাজা জোনাকিকে হত্যা করে তিনি রাজা সাজতে পারেন কিন্তু কখনো সিংহাসনে বসার যোগ্য হয়ে ওঠেন না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর কতটা জানেন আমার জানা নেই। তিনি নিজের ঘর (জাতীয় কংগ্রেস) ভেঙে দল গড়েছিলেন। তার তেরো বছর পর মুখ্যমন্ত্রী হন। দুর্নীতির পাঁকে ডুবতে থাকা সেই ঘর বাঁচাতে এখন তিনি মরিয়া। অনেকে বলেন মমতা সম্প্রদায়গত তুষ্টীকরণ আর স্বজনপোষণে আচ্ছাদিত। তার ওপর দুর্নীতিপরায়ণদের আশ্রয় দেন আর মধু ভোগ করেন। এতটা অত্যুক্তি মেনে না নিলেও এটা নিশ্চিত যে মমতা দুর্নীতিতে অনেকটাই কর্দমাক্ত, যদিও তিনি মানতে নারাজ, কারণ তা প্রমাণসাপেক্ষ। সম্প্রতি রামনবমীর মিছিল ঘিরে রাজ্যে কিছু অবাঞ্ছিত সমস্যা দেখা দেয়। অভিযোগ ওঠে তার মূলে ছিলেন মমতা। সংখ্যালঘুদের তুষ্টির আশায় তিনি তাঁর অঙ্গুলি হেলিয়েছিলেন। মমতা যদি সে দোষ করে থাকেন তাহলে মানতেই হবে যে ভোটের আশায় তিনি রাষ্ট্রধর্ম পালন থেকে সরে গিয়েছেন। আর তিনি সবার বা সব সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী নন।

তবে এটা খুব দৃষ্টিকটু যে মমতার রাজত্বকালে হিন্দুদের শোভাযাত্রাকে সবসময় দাঙ্গাবাজ আর বৈরী চোখে দেখা হয়। তার আকর বিরোধী যে কংগ্রেস আর বাম তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মমতা হাস্যকরভাবে বলতে থাকেন যে হিন্দু মিছিল রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের হাতিয়ার। বিশেষ সম্প্রদায়ের মিছিল ধর্মীয় আর শান্তিপূর্ণ। মমতা অবশ্য দাবি করেন সব সম্প্রদায়ের মানুষ তার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। অনেকে বলেন, হিন্দুদের সম্মান রক্ষার্থে মমতা অনেকটা উদাসীন। আমার ধারণা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সম্প্রদায়গত রাজনীতির ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করতে হয় মমতা জানেন না। না জানাটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ এ ব্যাপারে মমতার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আর প্রশিক্ষণ নেই। পথনেত্রী হিসেবেই মমতার উত্থান। রাজ্য আইনসভায় তিনি কখনও বিরোধী ছিলেন না। এখন তাঁর আশপাশে অনেক স্তাবক রয়েছেন। তাঁকে ওয়াকিবহাল করার কেউ নেই। মমতার বোঝা প্রয়োজন যে ধর্ম যেমন ধারণ করে, তা আচরণও শেখায়। ধর্ম পালনকে কেবল উৎসব হিসেবে দেখলে তার অনেকটাই অমর্যাদা হয়।

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সম্প্রদায়গত রাজনীতির ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করতে হয় মমতা জানেন না। না জানাটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ এ ব্যাপারে মমতার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আর প্রশিক্ষণ নেই।

কবিগুরুর ভাষায় 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি। বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।' অস্বীকার করা যাবে না সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সাগরদিঘির উপনির্বাচনের হার মমতা মেনে নিতে পারেননি। তাই ভবিষ্যতে যেনতেনপ্রকারে সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করতে হবে মমতাকে। রাষ্ট্রধর্ম পালনের বড়ো অংশ সব সম্প্রদায়ের হিত করা। মমতা তা কিছুতেই পারবেন না। ভোটের নিরিখে রাজ্যের ৫২ শতাংশ মানুষ তাঁকে সমর্থন করেননি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের সব গোষ্ঠী আর সম্প্রদায়ের বিশ্বাস পাওয়াটা তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ছিল। তা পালনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ১৯৯৫-এর পর সম্প্রতি (জানুয়ারি ২০২৩) দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট আবার জানিয়েছেন হিন্দুত্ব জীবন ধারণের উপায়। এই ধর্মে কোনো গোঁড়ামি নেই। তাহলে সংখ্যালঘু ভোটের লোভে মমতা কি ইচ্ছা করেই এই সত্যে চোখ উলটে রাখেন? কিন্তু কতদিন? সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই। আর তখন অনেককেই সুড়ঙ্গ খুঁজতে হবে। □

একেই বলে প্রায়শ্চিত্ত
বাংলার মেয়ে শুধু বাংলার

শাস্তিদাত্রীষু দিদি,

মনটা ভালো নেই দিদি। তৃণমূল আর জাতীয় দল নয়। ঘোষণা করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী জাতীয় দল হতে গেলে তিনটি শর্তের অন্তত একটি পূরণ করতে হয়। এক, লোকসভায় অন্তত চারটি রাজ্য থেকে ৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে। দুই, লোকসভায় ৩টি রাজ্য থেকে অন্তত ১১টি আসন (মোট আসনের ২ শতাংশ) জিততে হবে এবং আগের জেতা আসনের অন্তত চারটি পুনরায় জিততে হবে। তিন, অন্তত চারটি রাজ্যে 'রাজ্য দলের' তকমা পেতে হবে। জোড়াতালি দিয়ে হলেও সেটা ছিল এতদিন। কিন্তু আর নেই। বড়ো কষ্ট হচ্ছে দিদি। বাংলার মেয়েকে শুধু বাংলাতেই থেকে যেতে হবে। দিদি, বিশ্বাস করুন কষ্ট হচ্ছে আপনার ভাইপোটার জন্য। কত সাধ করে আপনি 'সর্বভারতীয়' সাধারণ সম্পাদক করেছিলেন। সেও কত আশা নিয়ে বলেছিল, দলকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু একেই বলে কপাল!

নির্বাচন কমিশনের যা নিয়ম তাতে দশ বছর মানে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের মর্যাদা আর পাবে না তৃণমূল। মানে দুটো লোকসভা নির্বাচন। ভাবা যায়! জাতীয় দলের প্রার্থীরা ভোটে দাঁড়ানোর সময় মনোনয়নে একজন প্রস্তাবক লাগে। সেই সুবিধা থাকবে না। ভোটের সময়ে জাতীয় দলগুলিকে গোটা দেশেই ভোটার লিস্টের দুটি কপি বিনামূল্যে দেয় নির্বাচন কমিশন। আর মিলবে না। রাজধানী দিল্লিতে জাতীয় দল জমি বা বাড়ি পায় দলীয় দপ্তর বানানোর জন্য। তেমন কপাল আর হলো না। যে কোনো নির্বাচনের সময়ে জাতীয়দল প্রচারের জন্য ৪০ জন তারকা রাখতে পারে। গত ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও তৃণমূল সেই সুবিধা পেয়েছিল। কিন্তু তা আর মিলবে না দিদি। এখন প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ ২০ জন তারকা রাখা যাবে। ফলে কোনো রাজ্য নির্বাচনে প্রচার করতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল নেতারা গেলে ৪০ জনের খরচ দলের হাতে থাকবে না। ২০ জনের বেশি কেউ প্রচার করতে গেলে তাঁর যাতায়াত-সহ অন্যান্য খরচ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নির্বাচনী খরচের সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে টাকা চুরির আরও একটা কেরামতি হাওয়া। জাতীয় দলের ভোট প্রচারের জন্য সরকারি টিভি ও রেডিয়োতে বিনা খরচে সময় দেওয়া হয় নির্বাচনের সময়। সেই সুবিধাও উবে গেল।

কিন্তু দিদি, আমি না অন্য কথা ভাবছি। দেখুন, দল এই সাজাটা ঠিক কখন পেল। দল যখন রামভক্তদের উপরে অত্যাচার করছে, পুলিশ দিয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সাজা দিচ্ছে তখন। আর বেশি করে তপনের ঘটনার পরে। যে ঘটনা নিয়ে গোটা দেশ ছিঃছিঃ করছে। সেই সময় দাঁড়িয়ে তৃণমূল অত্যাচারের জন্য জাতীয় আলোচনায় থাকলেও জাতীয় দল আর নয়। দিদি, আপনি সবই জানেন তবু বলছি, তপন বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডুর উপস্থিতিতে গোফানগর অঞ্চলের প্রায় ২০০ জন মহিলা এবং তাঁদের পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন শনকইর গ্রামের বাসিন্দা মার্টিনা কিস্কু, শিউলি মারডি, ঠাকরান সোরেন ও মালতী মুর্মু। সেই কথা চাউর হতেই চারজন জনজাতি মহিলাকে বালুরঘাট নিয়ে যাওয়া হয় এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূল মহিলা মোর্চার জেলা সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তাঁদের 'ঘরওয়াপসি' হয়। তার আগে অবশ্য 'প্রায়শ্চিত্ত' করতে হয় চার মহিলাকে। বালুরঘাট কোর্ট মোড় থেকে তৃণমূল পার্টি অফিস পর্যন্ত দণ্ডি কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের।

কী লজ্জার ঘটনা বলুন তো! আপনি অবশ্য চুপ থাকেননি। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরেই নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে আপনার দল। জেলা সভানেত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে অভিযুক্ত মহিলা তৃণমূল নেত্রীকে। সম্ভবত খানিক 'প্রায়শ্চিত্ত' করতেই 'ব্রাহ্মণ' প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে সরিয়ে দায়িত্ব দিয়েছে জনজাতি স্নেহলতা হেমব্রমকে। কিন্তু এতেই কি ক্ষমা পাওয়া যায়? ওই অন্যায়ের সাজা তো পেতেই হবে। ভোটার বিধাতা পরে দেবে। কমিশন বিধাতা দিয়ে দিয়েছে। যদিও অন্য কারণে। তবু আমি কেমন যেন মিল দেখতে পাচ্ছি। সম্মান যে দিতে পারে না, তার সম্মান পাওয়ার অধিকার নেই। আরও একটা প্রশ্ন আছে দিদি। ক্ষমার চোখে দেখবেন প্লিজ। আপনার দলের এক সাংসদ বলেছেন দলের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করেই দলে ফিরতে হয়। কিন্তু দিদি মুকুল দাদা, রাজীব দাদা, সব্যসাচী দাদারাও কি প্রায়শ্চিত্ত করেছেন? শুনেছি, মোটা টাকার 'ফাইন' দিতে হয়েছিল দলকে। তবে প্রমাণ দিতে পারব না। আরও একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি আপনার দলের দিনরাত ফটর ফটর করেন। একসময়ে আপনাকে দিদি, আপনাকে সরাসরি সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী বলা কুণাল ঘোষ। আচ্ছা, ওঁকেও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল? জনজাতি মহিলারা দণ্ডি কাটলেন, আর ওঁদের ছাড় কেন? বাংলা তার নিজের মেয়ের কাছে জানতে চায়। □

অতিথি কলম

চেতন ভগত

ভারতীয়রা বিশ্বের সুখীতম মানুষ

বিশ্ব সুখ সমৃদ্ধির রিপোর্টে ভারতের যে অবস্থান দেখানো হয়েছে তা হাস্যকর ভাবে অত্যন্ত নীচের দিকে। এর মূলে রয়েছে ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সফল করার অদম্য স্পৃহাকে আদৌ অনুধাবন না করতে পারা। পাশ্চাত্যের এই বিশ্লেষকরা বুঝতেই পারেননি যে আরও ভালো কিছু করে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা মানেই আমরা অসুখী।

প্রসঙ্গত, বিশ্ব সুখানুভূতি সূচক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই এটি বিশ্বব্যাপী খানিকটা নাড়াচাড়া ফেলেছে। আর একই সঙ্গে বরাবরের মতোই এটি একটি নির্বোধের পরিসংখ্যান চর্চা যা আদৌ এই ধরনের মনোযোগ দাবির উপযুক্ত নয়। ১৩৭টি দেশের (হিসেবের মধ্যে নেওয়া) মধ্যে ভারতের স্থান ১২৬তম। এর মাধ্যমে আমাদের বিশ্বের অন্যতম অসুখী দেশ হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্রাস্যকর ভাবে এই বিশ্লেষণ মোতাবেক যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন, ইরান, প্যালেস্টাইন বা দেউলিয়া অর্থনীতির মায়নামার, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান বা খুঁড়িয়ে চলা বাংলাদেশেরও নীচে আছি আমরা। কিন্তু আনন্দ পেতেই হবে এই ভেবে যে আমাদের প্রতিবেশীরা সুখে আছে।

তবে হ্যাঁ, বিশ্বের পণ্ডিতদের কাছে এটিই একমাত্র 'উন্মাদের পাঠ্যক্রম' নয় যাকে পবিত্র বাইবেলের মতো অকাট্য বলে তারা বিবেচনা করে। গত বছর বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বলে আরও একটি আজব তালিকানামা পণ্ডিতরা প্রকাশ করেছিল। যেখানে আলোচিত ১২১টি দেশের মধ্যে ভারত কোনোক্রমে ১০৭ স্থানটি জুটিয়েছিল। উত্তর কোরিয়া ইথিওপিয়া, সুদান, রওয়ান্ডা, নাইজেরিয়া বা কঙ্গোর মতো দুর্ভিক্ষ তাড়িত ছোটো ছোটো আফ্রিকান দেশগুলিও আমাদের আগে ছিল।

বিশ্ব সুখানুভূতির সূচকটি প্রকাশের কর্তা হলো রাষ্ট্রসঙ্ঘের আনুকুল্য প্রাপ্ত একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Sustainable development solution network। এই SDSN তুলনামূলক ভাবে ছোটো একটি সংস্থা যাদের বার্ষিক আর্থিক লেন-দেনের পরিমাণ মাত্র ১১ মিলিয়ন ডলার। এই অর্থের অধিকাংশই অনুদান।

সংস্থার পিডিএফ ডকুমেন্টের মধ্যে অতি আবশ্যক ৩টি তথ্য থাকে। প্রথমটি অত্যন্ত বহুবর্ণরঞ্জিত এবং সুন্দর আঙ্গিকে দেওয়া। দ্বিতীয়টিতে অগুনতি চার্ট ও অর্থনীতির পরিসংখ্যান দেওয়া অসংখ্য টেবিল এবং একটি নিতান্তই সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য শব্দবন্ধ 'regression coefficient' অর্থাৎ সবটাই আদ্যপ্রান্ত অ্যাকাডেমিক চর্চা।

তৃতীয়ত, অজস্র ফটো যার মধ্যে আবার দেখার তিনটি নির্দেশিকা আছে। প্রথমত, সেই ছবিগুলি অবশ্যই কোনো পরিবারের হওয়া দরকার যেখানে মহিলারা আবশ্যিকভাবে শিশুদের নিয়ে থাকবে। ছবির বিষয়বস্তু অবশ্যই স্বভাব লাজুক এবং বেশভূষায় দেখতে গরিব হতে হবে, কিন্তু এই বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও তাদের হাস্যমুখী থাকতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত, সুখ যেন মুখশ্রী থেকে নির্গত হয়। অর্থাৎ বরাত অনুযায়ী ছবি তৈরি হবে। তৃতীয়ত, একটি উন্নতিশীল দেশের কয়েক জন মানুষ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে, আশপাশে শস্য বা গবাদিপশু থাকা চাই। সব মিলিয়ে এমন একটা পারিপার্শ্বিক ও মনুষ্য চেহারা উঠে আসবে যেখানে মনে হবে এরা আরও সমৃদ্ধতর বিশ্ব আকাঙ্ক্ষা করে। অথচ মজাটা দেখুন, এই সংস্থার সমীক্ষা এত কিছু করার মাধ্যমে বিশ্বের কোন দেশের মানুষ সর্বাপেক্ষা সুখী সেটাই তারা প্রকাশ করতে চায়। কে আরও সুখের প্রত্যাশা করে সেটা নয়। বাস্তবে সুখ শব্দটি একটি অপরিমাপযোগ্য আবেগপ্রবণ শব্দ, ঠিক যেমন খিদে। এই জন্যেই গালভরা কোনো বড়ো সমীক্ষা চালাতে গেলেই সেখানে বেশ মনটানা, বেশ আবেগপ্রবণ মনোগ্রাহী কয়েকটি শব্দ থাকা দরকার।

তাহলে এই সমীক্ষকরা কীভাবে কে সুখী, কে অসুখী বিষয়টা পরিমাপ করে? এটা কী সম্ভব গোটা বিশ্বময় তারা মানুষকে ধরে ধরে প্রশ্ন রাখছে 'ভাই তুমি কি সুখী'? না, তা করা হয় না। সেটা খুবই সহজ পদ্ধতি হয়ে গেল। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের এই গরিব, লাজুক, কালো মানুষেরা সুখানুভূতি সম্পর্কে জানেই-বা কী? আমরা সমীক্ষকরাই সুখের মানদণ্ডগুলির সম্পর্কে তাদের বোঝাবো যে কেমন ভাব মনে জাগলে সুখী বলা যায়। তারপর তাদের মধ্যে থেকে ঝাড়াই বাছাই

আমাদের সম্পদ কম থাকতে পারে। আমাদের বহু রাস্তা যেতে হতে পারে। ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বের বহু স্থান দেশ ভ্রমণ ও বসবাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওই দুর্বোধ্য 'হতাশা সূচক' তৈরি না করে বাজি রেখে বলতে পারি, ভারতীয়রা বিশ্বের মধ্যে সুখীতম মানুষ।

করব। বুঝুন অবস্থা। যে মানদণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি কী ও কেমন। একটি বিশাল মাত্রার Gallup World Poll হয়। এই নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে প্রশ্ন করা হয় তারা জীবনে অর্থাৎ জীবন প্রতিপালনে চাকরি, ব্যবসা বা অন্যকিছুতে কোন বিন্দুতে অবস্থান করছে (১ থেকে ১০-এর মধ্যে) বলে মনে হয়। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ মাত্রা ১০ ধরলে তারা ঠিক কোথায় পৌঁছতে পারবে?

এক্ষেত্রে উত্তরদাতারা যদি বলেন, নীচের দিকে আছেন ভবিষ্যতে আরও ওপরে উঠতে চান এবং বিশ্বাস করেন উঠবেন। জীবনে উচ্চাশা পোষণ করেন— সেক্ষেত্রে এখন যেখানে রয়েছি বা নিত্য সঠিক উচ্চস্থানের জন্য প্রয়াস করছি তাহলে আমাকে অসুখী ধরা হবে। অসাধারণ মূল্যায়ন! এই ভোটকর্তারা প্রত্যেক দেশে ৫০০ থেকে ২০০০ লোককে এই প্রশ্ন করে থাকেন। তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হয়েছে এখন ২০০০ লোকের জীবনের বর্তমান অবস্থান আর তারা কোথায় পৌঁছতে চায় তা নির্ধারণ করে দিচ্ছে ১৪০ কোটি লোকের একটি জাতির সামগ্রিক সুখানুভূতির সূচক!

সমীক্ষকদের এই যৌথ মহাবৌদ্ধিক প্রজ্ঞা আরও কতকগুলি আশ্চর্য বিষয়বস্তু ভিত্তি করে সুখ নির্ধারণে উপনীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় (এতে ধনী দেশগুলি এগিয়ে থাকবে আর এটি ধরে নেওয়ার মূলে রয়েছে অমোঘ তত্ত্ব-যত ধনী তত সুখী' সত্যিই অমোঘ সত্য)। দান-ধ্যান—হ্যাঁ, বড়োলোক দেশ, বেশি দান দক্ষিণা দেয় বইকী। দুর্নীতি (এটি আলাদা বিষয় কিন্তু খুবই চমৎকার)। সমাজ কল্যাণ বাবদ খরচ (বড়োলোক দেশগুলি অবশ্যই বেশি খরচ করে ফলে তারা তো এগিয়ে থাকবেই)। এরপর রয়েছে আমরা এককভাবে স্বাধীন কোনো সিদ্ধান্ত কি নিতে পারি? পারি না। আমাদের যূথবদ্ধ সমাজ। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ খেয়ালখুশি মতো চলায় বেশি পয়েন্ট পেয়ে এগিয়ে থাকবে। এছাড়াও আরও কিছু মানদণ্ড আছে সেগুলি হয়তো ভালো উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে। কিন্তু যে কোনো সাধারণ জ্ঞান সংবলিত ব্যক্তি সাম্প্রতিক ফলশ্রুতিগুলির ওপর নজর করলেই বলবেন এসবের কোনো মানে হয় না। উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে এই সমীক্ষার প্রধান বিজয়ীর দিকে তাকাতে হবে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুখী দেশের নাম— যে একনাগাড়ে ৬ বার এই আহ্লাদেভরা পুরস্কার জিতল— হলো 'ফিনল্যান্ড'।

এই দেশটি বিশ্বের শেষপ্রান্ত উত্তর গোলার্ধের একদম কাছে। দেশটির অংশবিশেষে শীতের সময় তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রির কাছে থাকে। ফিনল্যান্ডে এমন জায়গাও আছে যেখানে বছরে প্রায় দু' মাস সূর্যোদয় হয় না। কল্পনা করুন, ৫০ দিন ও ৫০ রাত নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বিদ্যুতের বিষয় ছেড়ে দিন। এমন বিচিত্র প্রাকৃতিক উপহারের রেশ ফিনল্যান্ডবাসীর ওপর আছে। তারা অধিকাংশই নীরব থাকে, বিশেষ কথাবার্তা বলে না। হায়! পণ্ডিতপ্রবর এমন একটি অঞ্চলকে আপনারা বিশ্বের সুখীতম আশ্রয় খেতাব দিয়ে চলেছেন?

কখনও ভারতে অনুষ্ঠিত একটা আইপিএল ম্যাচ দেখেছেন? কিংবা আমরা কীভাবে আমাদের উৎসব, পূজা, পালাপার্বণগুলি উদ্‌যাপন করি? কিংবা যখন আমাদের পরিবারে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়? কিংবা যখন পরিবারে কোনো নবজাতকের আবির্ভাব হয়? মনে প্রশ্ন জাগে, আলোচ্য সমীক্ষার প্রজ্ঞাবান মানুষেরা কখনও বিশ্বব্যাপী কোনো হতাশা-র সূচক তৈরি করেছেন? কিংবা বিচ্ছেদ হার (divorce rate)? পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, আত্মীয়ের সঙ্গে ছেলেপুলেরা কত ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ করে? আর আমাদের এখানে সে হার কেমন? দাদু, ঠাকুমার সঙ্গে নাতি-নাতনিরা কতটা ঘনিষ্ঠ? সব চেয়ে বড়ো কথা, এ দেশের মানুষ ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কী অপার শান্তিটুকু পায়! এগুলি সবই কি মানব জীবনে প্রয়োজন বা উপযোগিতাহীন? কেবলমাত্র টাকার মানদণ্ডই শেষ গন্তব্য? নিশ্চয় এটা তাদের তৈরি সমীক্ষা। যা তাদের ভালো লাগবে তারা সেটাই করবে। সেই মতোই ডাটা ওলটপালট করবে। কিন্তু এই পন্থায় তাদের নীচতাটি প্রকাশ্যে এসে যাচ্ছে। বড়ো বড়ো বাণী, পিডিএফ দেওয়া হাজার হাজার পাতা লেখা আর সদিচ্ছা থাকলেও যা তারা প্রকাশ করেছে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমি দৃঢ়ভাবে আবেদন করছি, এই সমীক্ষকরা একবার ভারত পরিভ্রমণ করে দেখুন। এখানের লোকের মুখের হাসি ও ভালোবাসার বিচ্ছুরণ কেমন চতুষ্পার্শ্বে বিকশিত। আমাদের সম্পদ কম থাকতে পারে। আমাদের বহু রাস্তা যেতে হতে পারে। ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বের বহু স্থান দেশ ভ্রমণ ও বসবাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওই দুর্বোধ্য 'হতাশা সূচক' তৈরি না করে বাজি রেখে বলতে পারি, ভারতীয়রা বিশ্বের মধ্যে সুখীতম মানুষ।

(লেখক একজন ঔপন্যাসিক, নিবন্ধকার, বক্তা ও চিত্রনাট্যকার)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

গত ১৮ মার্চ মধ্য হাওড়ার পূর্বপ্রচারক সলিল সেনগুপ্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর পিতা স্বর্গীয় দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ছিলেন বোড়াল অঞ্চলের এক জনপ্রিয় আয়ুর্বেদিক ডাক্তার এবং নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক। সেজভাই প্রয়াত অরূপ সেনগুপ্ত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ নগরের পূর্ব বৌদ্ধিক প্রমুখ। তিনি তাঁর মধ্যম ভ্রাতা বিপুল সেনগুপ্ত, বড়ো ভগিনী শ্রীমতী মঞ্জুলা সেনগুপ্ত, কনিষ্ঠ ভগিনী শ্রীমতী প্রণতি সেনগুপ্তকে রেখে গেছেন। সলিলদা ১৯৮০ সালে তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত করে মধ্য হাওড়া অঞ্চলে প্রচারক জীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে সুন্দরবন অঞ্চলের বাসন্তীতে একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসেবে ব্যক্তিগত কর্মজীবন শুরু করেন। আজীবন তিনি বোড়াল শ্রীপুর নিবাসী ছিলেন। গত ৯ এপ্রিল বাঁশদ্রোণী সঙ্ঘ কার্যালয়ে তার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

রেখো না মা কেবল বাঙ্গালি করে

সুব্রত দত্ত

'রেখেছ বিজেপি করে, বাঙ্গালি করোনি! বাংলায় হনুমান জয়ন্তীর ধুমধামে কি 'অস্ত্র' গেল মমতার হাতে?' এটি বহু পুরোনো এক বাংলা দৈনিকের অনলাইন সংস্করণের হেডলাইন। বহুদিন ধরেই এই পত্রিকা এবং আরও কয়েকটা প্রথম সারির পত্রিকা বলে দাবি করা কাগজ পড়ে একটা জিনিস অনুধাবন করতে পারছিলাম, অন্য কোনো পেশায় যাওয়ার অক্ষমতার কারণে বেশ কিছু হতাশাগ্রস্ত মানুষ (সবাই নয়) সাংবাদিকতাটাকেই পেশা হিসেবে নিয়েছেন। এদের তথ্য উপলব্ধির গভীরতা বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা একটা বড়ো শূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে কবিতার একটা বিকৃত শব্দ স্থানান্তর আর পরিবর্তন করে এই হেডলাইনটা করা হয়েছে, সেটা অধিকাংশ বাঙ্গালিরই পড়া— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গমাতা', যার শেষ দুটি লাইনে রয়েছে 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী/রেখেছো বাঙ্গালি করে মানুষ করনি।' এই কবিতার আরও কটি লাইনে দেখা যাক তিনি কী বলেছেন, '...পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে/বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালোছেলে করে। ...শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে/দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।' রবীন্দ্রনাথ নিজেই বোঝাতে চেয়েছেন খালি রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী করে কেবলমাত্র বাঙ্গালি তকমা পাওয়ার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আরও বড়ো গণ্ডি পেরোতে হবে। কুচুটে বুড়ো-বুড়িদের মতো আচরণ বন্ধ করতে হবে। একই রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনো নাগরিক অবাধে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে বিচরণ করবে, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির প্রভাব ও বিস্তার ঘটবে দেশের সমস্ত অংশে, তবেই রাষ্ট্রীয় সংহতির কাঠামো সুদৃঢ় হবে। রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী দুটোই রাষ্ট্রের সনাতন ধারার অন্যতম বাহক। যদি কোনো কারণে হনুমান জয়ন্তীর বাঙ্গালিদের মনে ঢুকতে একটু দেরি হয়ে থাকে সেটা বাঙ্গালিদের বোধশক্তির আংশিক অক্ষমতা। দেরিতে হলেও ইতিবাচক, অন্তত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাঙ্গালি থেকে মানুষ হবার দিকে যাত্রার শুভ সূচনা।

চৈত্র মাসের শুক্ল পূর্ণিমায় ভগবান শিবের ১১তম অবতার রূপে অবতীর্ণ হনুমানের জন্মতিথিকে ব্রহ্মচারী, কুস্তিগির, ব্যায়ামবিদ-সহ অগণিত মানুষ হনুমান জয়ন্তী রূপে পালন করেন। নিঃস্বার্থ সেবা, নম্রতা এবং একনিষ্ঠ ভক্তির প্রতীক একজন আদর্শ কর্মযোগী হিসেবে পরিচিত পবনপুত্র হনুমান বা বজরংবলী।

> **স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়— "তাই বলছি, দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।"**

আধুনিকতার নামে দিশাহীন অস্থির সমাজে আজ অত্যন্ত প্রয়োজন সুস্থ ও বলবান শরীরে নম্রতার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে গুরুর (পিতা, মাতা, শিক্ষক, আধ্যাত্মিক গুরু) প্রতি ভক্তি নিয়ে নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাবে দৈনন্দিন জীবনচর্যার অনুশীলন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়— "তাই বলছি, দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।" তাই কোটি কোটি টাকা সরকারি তহবিল ব্যয়ে উৎসবের নামে কার্নিভাল করার থেকে হনুমান জয়ন্তী ও রামনবমী উদ্‌যাপন বেশি প্রয়োজনীয়।

সংবাদ পরিবেশনার ভূমিকা দেখে ইদানীং বহু নাগরিক তথা পাঠক সংবাদপত্র ও একশ্রেণীর সাংবাদিকদের প্রতি 'দালাল' বিশেষণটা চালু করেছেন। আমার মনে হয় খালি দালাল নয়, হালাল শংসাপত্রের জন্যেও এরা খুব উদ্‌গ্রীব। বেশ কয়েক বছর ধরে নবি দিবসের ধুম বেড়ে গেছে। বাঙ্গলার উৎসবের মধ্যে এটা কি অন্তর্ভুক্ত ছিল? হালাল সার্টিফিকেট নেওয়া থাকলে এগুলো চোখে পড়ে না যেমন চোখে পড়ে না বেশ কিছু স্কুলে সরস্বতী পুজো করায় বাধা আসে। চোখে পড়ে না হাজার হাজার একর ওয়াকফ সম্পত্তি, মসজিদ, মাদ্রাসা থাকতেও রেলওয়ে প্লাটফর্ম, ব্যস্ততম সড়ক, জাতীয় সড়কের উপরে বসে ইফতার পার্টি, নমাজ পড়া চলে।

আমরা নিজেদের কেবল বাঙ্গালি ভেবেছিলাম বলেই অর্ধেকের বেশি বাঙ্গালি বিধর্মী হয়ে গেল। তাই কবিগুরুর 'বঙ্গমাতা'র শেষ দুই লাইনকে স্মরণে রেখে বলি, রেখো না মা কেবল বাঙ্গালি করে, রাষ্ট্রীয় ভাবেও আমাদের উদ্বুদ্ধ করো। □

রিষড়া ও শিবপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলার ঘটনা হিন্দু সমাজের চোখ খুলে দিয়েছে

সাম্প্রতিককালে রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে হাওড়ার শিবপুর ও হুগলি জেলার রিষড়া শহর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিরিখে সংবাদপত্রের শিরোনামে চলে এসেছে। অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনার বিশদ বিবরণ ইতিমধ্যে আমরা সংবাদপত্রে লক্ষ্য করেছি। এই দুটি জায়গার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানে অনেকেই শক্তিশালী হিন্দু সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। আজ ঘটনাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যায় না গিয়ে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু জ্বলন্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। রিষড়ার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর নিম্নলিখিত সাক্ষাৎকার থেকে বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে যা সকলের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা যায়।

আনন্দ মোহন দাস

□ আপনাদের রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিজেপির নেতা দিলীপ ঘোষ-সহ বেশকিছু বিজেপির নেতা-নেত্রীকে দেখা গেছে। এই কার্যসূচি কী বিজেপির পরিচালনায় হয়েছিল?

● **উদ্যোক্তা :** সম্পূর্ণ মিথ্যা। রিষড়ার রামনবমীর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল শ্রীরাম জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে। সমিতির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বিজেপির নেতারাও ব্যক্তিগত ভাবে প্রতি বছরের মতো এবারও শোভাযাত্রায় রামভক্ত হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। চল্লিশ হাজার রামভক্তের মধ্যে বিজেপির লোক অতি নগণ্য। শোভাযাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলমত নির্বিশেষে অন্য দলের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন। এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মঞ্চ।

□ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রামনবমী ৩০ মার্চ হয়ে গেছে। অথচ দাঙ্গা লাগানোর উদ্দেশ্যে ২ এপ্রিল শোভাযাত্রা বের করা হয়েছে। আপনাদের বক্তব্য কী?

● **উদ্যোক্তা :** খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমরা অজ্ঞতার বশে অনেক সময় ভুল তথ্য পেশ করে থাকি। সারা ভারতের হিন্দু সমাজ রামনবমী থেকে হনুমান জয়ন্তী (এবার ৬ এপ্রিল) পর্যন্ত রামনবমী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে শোভাযাত্রা বের করে থাকে। সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও আমরা সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব একইভাবে পালন করে থাকি। এ বছর নতুন কিছু নয়। তাছাড়া অধিকমাত্রায় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য প্রশাসনের অনুমতিতে ছুটির দিনে রাখা হয়েছিল। সেজন্য অভিযোগটি একেবারে ভিত্তিহীন। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য দাঙ্গাকারীদের উৎসাহিত করবে।

□ অনেকে অভিযোগ করেছেন আপনারা বিনা অনুমতিতে মুসলমান প্রধান এলাকার মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে গেছেন। মুসলমানবহুল এলাকায় দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন।

● **উদ্যোক্তা :** এই অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা। পুলিশ প্রশাসন থেকে বিধিবদ্ধ অনুমতি নিয়েই রিষড়া থেকে মাহেশ পর্যন্ত নির্ধারিত রুটে শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একই রুটে বহু বছর যাবৎ শান্তিপূর্ণভাবে সমিতি রামনবমীর শোভাযাত্রা বের করে থাকে। কখনো কোনোরকম অশান্তি ঘটেনি। এই বছর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে রাম ভক্তদের উপর হামলা করে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। তাছাড়া রামচন্দ্রের দেশে রামকে এলাকাভিত্তিক ব্রাত্য করে শোভাযাত্রা বের করা যায় না। আমরা কি পাকিস্তান, আফগানিস্তানে বসবাস করছি?

□ শাসকদলের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেছেন উদ্যোক্তারা পরিকল্পিত ভাবে বাইরের লোক এনে নিজেরাই দাঙ্গা বাঁধিয়েছে।

● **উদ্যোক্তা :** অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। সরকারের হাতে প্রশাসন রয়েছে। কোনো বিচারপতিকে দিয়ে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই কারা দোষী প্রমাণ হয়ে যাবে। এই ধরনের উক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করি। আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি, শোভাযাত্রা বন্ধ করতে সংখ্যালঘু এলাকার দুষ্কৃতীরা কীভাবে আক্রমণ করেছে। এমনকী সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখা গেছে নিজ এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যালঘু যুবক রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবং বাড়ির আশপাশ থেকে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর ইট পাথর ছুঁড়েছে এবং গাড়ি-সহ অন্যান্য সম্পত্তির উপর অগ্নিসংযোগ করে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের উসকানি রয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। পুলিশও এই ধরনের আক্রমণের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিল না বলেই মনে হয়েছে। যার ফলে পুলিশ অসহায় নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই ঘটনায় পুলিশকর্মী-সহ প্রায় ১০/১২ জন মানুষ আহত হয়েছেন। একজন রামভক্তের আঘাত গুরুতর, তিনি পিজি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এমনকী বিজেপির এক বিধায়কও নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন।

□ এই বছর রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলার মূল কারণ কী হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন?

● **উদ্যোক্তা :** নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তবে অনেকেই মনে করছেন সাগরদিঘি উপনির্বচনে হারানো মুসলমান ভোট পুনরুদ্ধারে এবং সর্বস্তরে দুর্নীতি ঢাকতে শাসকদল

ফঃ ২

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা দানা বেঁধেছে।

□ এই ঘটনায় প্রশাসন দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে?

● **উদ্যোক্তা :** এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪২ জনের গ্রেপ্তারের কথা শোনা গেছে। তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্রকৃত দোষীদের বাদ দিয়ে বেশিরভাগ নির্দোষ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার জন্য হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আমরা অবিলম্বে নির্দোষ ব্যক্তিদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করছি।

□ এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হওয়ার জন্য কী করণীয় বলে মনে করেন?

● **উদ্যোক্তা :** কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা ছাড়া এর একমাত্র সমাধান হলো ঐক্যবদ্ধ হিন্দুসমাজ নির্মাণ।

রিষড়া শহরটি গঙ্গা নদীর নিকটবর্তী হুগলি জেলার অন্যতম একটি পুরনো শিল্পাঞ্চল। শহরটি রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। একসময় এখানে মূলত টেক্সটাইল, সিল্ক ও জুটমিল কারখানা ছিল। সারা ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম অকল্যান্ড জুটমিল এখানেই খোলা হয়েছিল। বর্তমানে অনেক কারখানা বন্ধ থাকলেও এখানে বহু শ্রমিকের বসবাস রয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ১১৫০০০ এবং জীবিকার সন্ধানে এই অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বসবাস রয়েছে। বিগত সেনসাস অনুযায়ী পরিসংখ্যানে দেখা যায় হিন্দু জনসংখ্যা হলো ৮৩.২৬ শতাংশ, মুসলমান ১৫.৯৩ শতাংশ এবং খ্রিস্টান ০.১১ শতাংশ। এখানে প্রায় ১৯০০ বস্তি রয়েছে। তথ্যসূত্রে জানা যায় এখানে বহু লোক বস্তি এলাকায় বাস করেন।

এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের বহু হিন্দিভাষী মানুষের বসবাস রয়েছে। কারখানাগুলি বন্ধ থাকায় বেকারত্বের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ পুরো মাত্রায় রয়েছে। এই সুযোগে জীবিকার সন্ধানে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গুলি হেলনে ওঠাবসা করাই হলো তাদের কাজ এবং এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে কিছু দেশবিরোধী শক্তি শান্তি ভঙ্গ করে দাঙ্গায় উসকানিমূলক প্ররোচনা দিয়ে থাকে। এই ধরনের অশুভ শক্তিকে প্রশাসনের কড়া হাতে মোকাবিলা করা একান্ত প্রয়োজন হলেও বাস্তবে তা লক্ষ্য করা যায় না। এই বছর রামনবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার উপর হামলার ঘটনা হিন্দু জনমানসে স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পুলিশ প্রশাসনের উপর জনগণ আস্থা হারিয়ে হিন্দু সমাজের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় হুগলি জেলায় রিষড়ার মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় স্থানীয় মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এবং বিশেষ ভাবে হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বাঁচার জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় খুঁজছেন। কেউ কেউ শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় ইট, পাথর ছোঁড়াকে পূর্ববর্তী কাশ্মীরের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অগ্নি সংযোগ করে এলাকায় বেশ কিছু সম্পত্তিও নষ্ট করা হয়েছে।

এই ধরনের ঘটনা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে। হিন্দুরা শিউরে উঠছেন। রিষড়ার ঘটনায় হিন্দু সমাজ আগামী দিনের ভয়াবহতার অশনি সংকেত হিসেবে দেখছেন। ভোটব্যাংকের স্বার্থে শাসক দলের নেতারা দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য করে এক বিশেষ সম্প্রদায়কে উসকানি দিচ্ছেন। এমনকী শাসকদলের নেত্রী মুসলমান এলাকার উপর দিয়ে রামনবমী শোভাযাত্রা করায় প্রশ্ন তুলেছেন এবং তিনি সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ কোনো ভাবেই বরদাস্ত করবেন না বলে হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন রোজার সময় নাকি মুসলমানরা কোনো অন্যায় কাজ করেন না। অর্থাৎ দাঙ্গার দায় হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিয়ো, টিভিতে দেখা গেছে সংখ্যালঘু দুষ্কৃতীরাই শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর রাস্তা ও বাড়ি থেকে লাগাতার ইট, পাথর ছুঁড়েছে, আগুন লাগিয়েছে। পুলিশ নির্বিকার থেকে অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। কার্যত পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। শোনা যাচ্ছে মুসলমানদের দাবি হলো মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুদের রামনবমীর শোভাযাত্রা করা চলবে না।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, রঘুপতি রাঘব রাজা রামের দেশে ভগবান রামচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বের করা কি নিষিদ্ধ? সংখ্যালঘু দুষ্কৃতীরা শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা মাফিক সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকায় আতঙ্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। হিন্দু জনমনে অসুরক্ষার ভাব সুনিশ্চিত করে এলাকা দখলের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে। অনেকে অভিযোগ করছেন সাগরদিঘি উপনির্বাচনে হারানো মুসলমান ভোট পুনরুদ্ধারে এবং শাসকদলের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতিজনিত ক্ষোভ থেকে জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতে শাসকদলের মদতেই নাকি দাঙ্গা করা হয়েছে। শাসকদলের নেতারা হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে রাম ভক্তদের দাঙ্গাবাজ আখ্যা দিয়েছেন অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার অগ্নিসংযোগকারী, ইট পাথর ছোঁড়া দাঙ্গাকারীদের নিন্দা না করে উৎসাহিত করেছেন। দুর্ভাগ্য, যে দেশের সঙ্গে রামনাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেখানে তাকেই ব্রাত্য করার অপচেষ্টা হলো। রাম হলো সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির ধারক বাহক। ভগবান রামকে ছাড়া ভারতবর্ষের কল্পনা অসম্পূর্ণ। গান্ধীজী রামরাজ্যের কথা বলেছেন। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জাতীয় জীবনে আদর্শের প্রতীক। প্রজাদের কাছে নিজের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে তিনি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পিছপা হননি এবং রাজধর্ম পালন করতে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছিলেন যা আজকের দিনে বিরল। রাজা বা প্রশাসক কী রকম হওয়া উচিত তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তিনি বুঝিয়ে গেছেন। অশুভ শক্তির প্রতীক রাবণকে পরাস্ত করে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ছিল তাঁর আদর্শ। সুতরাং শ্রীরামকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের কল্পনা করাই বৃথা। বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শের অনুসারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সেই অর্থে তাঁকে স্মরণ করে রামনবমীর শোভাযাত্রা বের করার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। এই ধরনের হামলা করে রামের মাহাত্ম্যকে কখনোই ছোটো করা যাবে না বলে ভারতীয়দের বিশ্বাস। □

সরকার চায় বলেই পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হয়

শাসক চাইলে দাঙ্গা হয়, না চাইলে হয় না। বাংলাদেশের শাসক চায়নি সেইজন্য রামনবমী শোভাযাত্রায় গোলমাল হয়নি। মমতা ব্যানার্জির সরকার চেয়েছে তাই হয়েছে।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। চলেছে বোমাবাজি, ইটবৃষ্টি, গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগও। বোমাবাজির দাপটে পুলিশকেই পালিয়ে যেতে দেখা যায়। তা থেকে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ে নবান্ন থেকে অদূরে সমগ্র শিবপুর অঞ্চল জুড়ে।

এবছর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সারাদেশে রামনবমী শান্তিতে পালিত হলেও একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সংগঠিত অশান্তি ও হিংসার ঘটনা ঘটেছে। শুধু এবারেই নয়, গত বছরও একইভাবে একই জায়গায় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়েছিল। গত বছরের থেকে শিক্ষা নিয়ে যেখানে পুলিশ এবং প্রশাসনের আগে থেকেই সতর্ক থাকা উচিত ছিল, সেখানে পুলিশকর্মীদেরকে অসহায়ভাবে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে দেখা গেছে। হাওড়ার ঘটনা প্রমাণ করেছে, এটি দেশের আইনশৃঙ্খলার পক্ষে অত্যন্ত বড়ো অশনি সংকেত। এটি আরও প্রমাণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। যদিও সরকার চাইলেই ঝামেলা ঠেকাতে পারত।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বামফ্রন্ট শাসনকালে এক সাংবাদিক তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে প্রশ্ন করেছিলেন— 'অনেক রাজ্যে দাঙ্গা হয়, আপনার রাজ্যে দাঙ্গা হয় না কেন?' উত্তরে জ্যোতিবাবু বলেছিলেন— 'সরকার দাঙ্গা চায় না বলে।' জ্যোতিবাবুর এই উত্তর যে কতটা সত্য ও খাঁটি তা আজ পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘটনার সত্যতা জানার জন্য রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট এবং ভিডিয়ো ফুটেজ তলব করেছেন। সেকারণে রাজভবন থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে দ্রুত তলব করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে পুরো ঘটনা সম্বন্ধে খবর নেন রাজ্যপাল।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোনে বিষয়টি জানানোর পাশাপাশি ঘটনার বিবরণ দিয়ে একটি চিঠিও লিখেছেন। প্রসঙ্গত, রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে হাওড়ার পাশাপাশি হুগলির রিষড়া এবং উত্তরবঙ্গের ডালখোলাতেও ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

অনেকেই মন্তব্য করছেন, এটা তো ঠিক যে এই রাজ্যে বিগত বারো বছর ধরে হিন্দুদের ধর্মপালনের ওপর অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে। তবে এটা যে ঘোষিত নয়, সেটাও ঠিক। পুলিশের অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠান করলেও এরাজ্যে একমাত্র হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে, শোভাযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করে কখনো পুলিশ, কখনো মুসলমানরা। অথচ তারা পুলিশের বিনা অনুমতিতেই নির্বিঘ্নে তাদের যে কোনো কর্মসূচি করতে পারে। পারে না শুধু হিন্দুরা। আর তা হবে নাই-বা কেন? সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই সবকিছু পরিষ্কার বোঝা গেছে। রাজ্যে বিরোধীদের নামে শুধুমাত্র

বিজেপি তথা হিন্দুদের ওপর যত আক্রমণ ঘটে তা শাসকের প্রশ্রয়েই ঘটে। যেমন— সাগরদিঘীর উপনির্বাচনের ফলাফল আলোচনার সময় রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে মন্ত্রীসভার সদস্য সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, সাবিনা ইয়াসমিন, আখরুজ্জামান, গোলাম রব্বানি, জাকির হুসেনকে যেভাবে ধমক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— 'তোমাদের তো অনেক দিয়েছি। অঢেল টাকা, ক্ষমতা। তোমাদের লোকেরা ক্রিমিন্যাল অফেন্স করলে সেভ করা, টোটাল সুযোগ পেয়েছে। তারপরেও কেন তোমরা আমাকে ভোট দেবে না?'

সেই বৈঠকে দিশেহারা ক্ষুব্ধ হতাশ তৃণমূল নেত্রী সকলের ওপরেই--- 'অকাজের ঢেঁকি', 'কাজের নামে অষ্টরম্ভা,' 'খালি খেতে পারে' বলে ক্ষোভ জানিয়েছেন। রেগে গিয়ে তিনি জানিয়ে দেন— প্রয়োজনে সব কটাকে তাড়াবেন। পরে তিনি মুসলমান মন্ত্রীদের জানিয়ে দেন— 'টাকা, ক্ষমতা, সুযোগ সুবিধা যা লাগে দেওয়া হবে। কিন্তু মুসলমান ভোট যেন অন্যদিকে না যায়।'

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে হিন্দুদের যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা অন্য কোনো ছুতোনাতায় মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর যে আক্রমণ করে, সে সাহস তারা কার কাছ থেকে বা কোথা থেকে পায়? সাধারণ লোকে মন্তব্য করছেন, ভোটের জন্য হেন কাজ নেই যা তিনি করতে ছাড়েন না। মুসলমানরা ক্রিমিন্যাল অফেন্স করলেও যে তিনি তাদের সেভ করেন তা নিজেই স্বীকার করেছেন।

খেজুরির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী তোপ দেগে বলেছেন, 'দিনের দিন মিছিল করো। আমার কোনও আপত্তি নেই। আপত্তি করিওনি। কিন্তু রামনবমীর মিছিল পাঁচদিন ধরে কেন হবে? এখন রমজান মাস চলছে। ওদের অনুমতি না দেওয়া সত্ত্বেও রামনবমীর মিছিল করছে। আর সংবেদনশীল এলাকাগুলোয় ঢুকে পড়ছে। ফলের গাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।' পালটা দিলীপ ঘোষের প্রশ্ন, 'রামনবমীর পরের দিন জুম্মার নামাজের পর বিশাল জনতা রাস্তায় নেমে তাণ্ডব করল।

জেহাদিদের হাত থেকে ধর্মরক্ষা করতে এবং বাঁচতে হলে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

আগুন লাগাল, ভাঙচুর চালাল। পুলিশ নীরব দর্শক কেন? রবিবার রিষড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় আমি নিজে ছিলাম। বিনা প্ররোচনায় পাথর বৃষ্টি হলো, ভাঙচুর হলো, পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল। কেন? আজ আমাদের আহত বিধায়ককে দেখতে উপদ্রুত এলাকায় আমাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যেতে চেয়েছিলেন। পুলিশ ১৪৪ ধারার ধুয়ো তুলে যেতে দেয়নি।' মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন— তিথি পেরনোর পরও কেন রামনবমীর মিছিল? দিলীপ ঘোষের জবাব— 'হিন্দু সমাজকে উনি খেপিয়ে দিয়েছেন। হিন্দু আবেগে আঘাত করেছেন। তাই মানুষ বেশি করে রাস্তায় নামছে। ভবিষ্যতেও নামবে। মুখ্যমন্ত্রীকে সাবধান করছি, আপনার ছেলেরা রাস্তায় নেমে গণ্ডগোল পাকালে, পাথর ছুড়লে তারপর পালটা প্রতিরোধ হলে কে সামলাবে যেন ভেবে রাখেন।'

একটা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে ঢাকা এবং আরও কয়েকটি এলাকায় হাজারে হাজারে হিন্দু ঢাক ঢোল, মাইক নিয়ে ৯০-৯৫ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে পুলিশের উপস্থিতি ছাড়াই নির্বিঘ্নে রামনবমীর শোভাযাত্রা করছে আনন্দ সহকারে। সেখানে কোনরকম গণ্ডগোল নেই। বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ ঐক্য মঞ্চের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিক বলেছেন— 'আমাদের এখানে উভয় সম্প্রদায় উভয় ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি কলকাতার মতো এলাকায় রামনবমীর শোভাযাত্রা আক্রান্ত হচ্ছে। ওখানে কি তালিবানি শাসন চলছে?'

গোবিন্দবাবুর কথা শুনে পুনরায় জ্যোতিবাবুর সেই মন্তব্য প্রমাণিত হলো যে— শাসক চাইলে দাঙ্গা হয়, না চাইলে হয় না। বাংলাদেশের শাসক চায়নি সেইজন্য রামনবমী শোভাযাত্রায় গোলমাল হয়নি। মমতা ব্যানার্জির সরকার চেয়েছে তাই হয়েছে।

একটা কথা অনেকেই বলেন, এরাজ্যে শাসকের দ্বারা এবং শাসকের প্রশ্রয়ে জেহাদিদের দ্বারা হিন্দুরা আক্রান্ত হলেও কেন্দ্র সরকার কোনোদিন পশ্চিমবঙ্গের শাসকের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ভাবে কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি সেই সিপিএমের আমল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতার রদবদল হলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আশা করেছিলেন--- কেন্দ্রে শক্তপোক্ত সরকার হয়েছে। এবারে রাজ্য সরকারের মদতে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে বা করালে কেন্দ্র চুপ করে তা দেখবে না। নিশ্চয়ই কঠিন কোনো ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু হা-হতোস্মি! কোথায় ব্যবস্থা! একুশের বিধানসভা ভোটের পর যেভাবে হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করা হলো, নির্যাতন করা হলো, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ঘরছাড়া, এমনকী রাজ্যছাড়া করা হলো তা দেখে দেশে এমনকী বিদেশেও মমতা সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছিল। কিন্তু কেন্দ্র কোনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। রাজ্য সরকারও দেখল এটাই মস্তবড়ো সুযোগ মুসলমানদের তোষণ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার। তারই অঙ্গ হিসেবে হিন্দুদের যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আঘাত নেমে আসছে।

তাসত্ত্বেও রাজ্যের হিন্দুরা বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখেছে। তবে এটাও ঠিক, জেহাদিদের হাত থেকে ধর্মরক্ষা করতে এবং বাঁচতে হলে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়েই বিজেপিকে এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আনতেই হবে। তাহলেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুদের উৎখাত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। সময় কিন্তু খুব কম। □

সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক মজবুত করতেই শাসকের দাঙ্গার চক্রান্ত

হীরক কর

কাশ্মীর থেকে কাজিপাড়া। ইটবৃষ্টি সর্বত্র। একশ্রেণীর মানুষের কাছে ইট-ই দেশের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের অস্ত্র। টার্গেট 'সিকিউরিটি ফোর্স'। কোথাও আর্মি, কোথাও-বা পুলিশ। কখনও 'মানবিকতা', কখনও 'ধর্ম নিরপেক্ষতা', শব্দগুলোকে সামনে রেখে ওইসব ইট ছোঁড়া ধর্মীয় কট্টরবাদী দুষ্কৃতীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রশাসন। বারবার এই একই ঘটনা ঘটে মেটিয়াবুরুজ, মোমিনপুর, ধুলাগড়, ফজিরবাজার-কাজিপাড়ায়। সরস্বতী পুজোর সময় খিদিরপুরের অভিজাত পাড়ার ঘটনা ভুলি কী করে। তদন্ত কমিটি হয়। এবার যেমন আসল কারণ খোঁজার দায়িত্ব পেয়েছে সিআইডি। কিন্তু তারপর?

২০২২-এর পর ২০২৩-এও একই ছবি। পুনরায় রামনবমীর দিন উত্তপ্ত হাওড়া। ফের রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলা। ঘটনাস্থল শিবপুর থানা এলাকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ঘটনাস্থলের অগ্নিগর্ভ অবস্থা দেখে র‍্যাফ নামানো হয়। কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে হাওড়ার শিবপুর।

৩০ মার্চ, বৃহস্পতিবার। বিকেল পাঁচটা নাগাদ রামনবমীর একটি শোভাযাত্রা হাওড়া ময়দানের দিক থেকে শিবপুরের কাজিপাড়া মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই শোভাযাত্রা হাওড়া জুট মিলের কাছে এলে পঞ্চসায়র অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্থানীয় দুষ্কৃতীরা ইট ও বোতল ছুঁড়তে শুরু করে। কয়েকটি দোকান এবং রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কিছু গাড়িতেও ভাঙচুর করে। এরপর অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। রাস্তার পাশে একাধিক দোকান ভাঙচুর হয়। শিবপুর থানার অন্তর্গত অলোকা সিনেমা, পিএম বস্তি, সন্ধ্যা বাজার, জিটি রোডের কাছে একাধিক জায়গায় অশান্তি ছড়াতে শুরু করে বিকেলের পর থেকেই। শিবপুর থানার কাছে একাধিক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। আগুন দেওয়া হয় ফুটপাথের বেশ কয়েকটি দোকানে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ময়দানে নামে পুলিশ।

সেদিন সন্ধ্যায় হাওড়ার সন্ধ্যাবাজারের কাছে অঞ্জনীপুত্র সেনা রামনবমীর শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল। শোভাযাত্রায় বোমা ও মোলটড ককেটেল (পেট্রল বোমা) ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে। শোভাযাত্রা লক্ষ্য করে বিয়ারের বোতল ও কাচের বোতল ছোঁড়া হয়। ঘটনাতে ১০-১৫ জন রামভক্ত আহত হয়েছে বলে খবর। তাদের হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

যখন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাওড়ার রামরাজাতলায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন তখনই হাওড়ার অন্যদিকে শিবপুরে রাম সেনানির শোভাযাত্রার উপর হামলা হয়। মুহূর্তের মধ্যে এলাকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পাঁচ তলার ছাদের ওপর থেকে

ইটবৃষ্টি শুরু হয়। বোতল ছোঁড়ারও ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়।

এলাকায় ছুটে আসে পুলিশ ও র‍্যাফ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে পুলিশ। কারা এই হামলা চালালো তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে চলে চিরুনি তল্লাশি। একাধিক ঠেলা ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। স্থানীয় বাজার, দোকানের ওপরও হামলা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। সংগঠকদের অভিযোগ, পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এদিকে হিংসার ঘটনায় ৫-৬ জন পুলিশকর্মী-সহ প্রায় ১০-১৫ জন জখম হন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকে অঞ্জনীপুত্র সেনারা। তাঁদের উপরে পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় বলেও অভিযোগ। শোভাযাত্রার আয়োজকদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপরে যারা হামলা চালালো তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।

অঞ্জনীপুত্র সেনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবা অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসনের সুবিধার্থে সেদিন অঞ্জনীপুত্র সেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ ৪২টি সংগঠন একত্রে এই শোভাযাত্রা বের করে। পুলিশ প্রশাসনকে এই শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার সুরক্ষার জন্য আগাম জানানো হয়। যদিও গত বছরের মতো এই বারেও সন্ধ্যাবাজার এলাকাতে শোভাযাত্রা প্রবেশের পরেই হামলা চালানো হয়। তিনি পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করে বলেন যদি অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে তাঁরাও প্রতিরোধের পথে হাঁটবেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, হিন্দুরা শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা করলে কীসের সমস্যা হচ্ছে এই আক্রমণকারীদের?

ময়দানে ধরনা অবস্থানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ছিল এটাই ২৯-এর ঘোষণা। পরদিন রামনবমী। তিনি জানিয়েছিলেন মিছিল আটকাবেন না। নাহ্, তৃণমূলের পতাকা হাতে শাসক দলের কর্মীরা মিছিল আটকায়নি। কিন্তু কারা আটকেছে? কারা ইট পাটকেল ছুঁড়ল শোভাযাত্রায়? হামলা চালানো হলো যথেচ্ছ? মুখ্যমন্ত্রী বলেননি। সেই ধরনা মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী দোষ চাপিয়েছেন শোভাযাত্রাকারীদের ওপর। জানিয়েছেন শোভাযাত্রার রাস্তা নাকি বদল করা হয়েছিল। পুলিশের অনুমতি ছাড়া রাস্তা বদল করা যায়? অথচ, স্থানীয়রা বলছেন, রাজনৈতিক থেকে ধর্মীয়, সব মিছিল, শোভাযাত্রা এই রাস্তাতেই জি.টি. রোড ধরে যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হাওড়ায় যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন দায়ী। তিনি বলেন, 'হাওড়ায় হিন্দুরা হামলা করেনি, যারা করেছে, তারা সব ক্রিমিনাল। বিজেপি এবং ওদের বজরং দল ও হিন্দু মহাসভা কীসব মাথামুণ্ডু আছে, তারাই এটা করেছে।' তিনি বলেছেন, দোষীদের শাস্তি দেবেন। তদন্ত হলো না। অপরাধী জানা গেল না, এখন পর্যন্ত কেউ চিহ্নিত হলো না। শাস্তির কথা আসছে কী করে? নাকি এই হামলাও স্ক্রিপ্টেড। শোভাযাত্রা যে রাস্তাতেই যাক না কেন হামলা হতোই। কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থার রিপোর্ট, শাসকদলের একাংশ দুষ্কৃতীদের দিয়ে ছাদ থেকে ইটবৃষ্টি করিয়েছে। আগুন লাগিয়েছে। অথচ বিশ্ব বিন্দু পরিষদ আগেই জানিয়েছিল, ৬ এপ্রিল হিন্দু দেবতা হনুমানের জন্মদিবস পর্যন্ত রামনবমী পালিত হবে। শোভাযাত্রা এবং পূজা-অর্চনা চলবে।

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূলের উসকানি আর পুলিশের অতিসক্রিয়তায় এই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মতে, 'হাওড়ার ঘটনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর প্রশাসন দায়ী। গত বছর শিবপুরে ঠিক এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলের অনুপ্রেরণায় রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর হামলা হচ্ছে'।

শুক্রবার পঞ্চশীল গ্যাঞ্জেস গার্ডেন কুন্দল বাগান মোড় এলাকায় কিছু বহুতলকে লক্ষ্য করে ফের ইট ও পাথর ছোঁড়া হয় কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের সামনেই। সেই সময় সেখান থেকে যাচ্ছিল সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়ের গাড়ি। ঘটনার জেরে তাঁর গাড়ির কাঁচও ভেঙে যায়। ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসিকের বাসিন্দারা। সকাল থেকে পুলিশ পিকেটিঙের মধ্যে থমথমে পরিস্থিতি থাকলেও আপাতভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল পুরো এলাকা। যদিও পুলিশের সামনে আবার নতুন করে ইট, পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ঘটল তাই নিয়ে নিজেদের সুরক্ষা ও পুলিশ প্রশাসনের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আবাসিকরা। এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের খোঁজে ওইদিনই ফোনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিবৃতি জারি করে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন রাজ্যপাল। রামনবমীর দিন কী ঘটেছিল, তা নিয়ে বিশেষ সেল তৈরি করা হয়েছে রাজ্যপালের নির্দেশে। রাজ্যপাল জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি পুরো বিষয়ের উপর নজর রাখছেন। প্রকৃত দোষীরা যাতে শাস্তি পায় সেই দিকে থাকবে বিশেষ নজর।

উল্লেখ্য, গত বছরেও অঞ্জনীপুত্র সেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রায় সন্ধ্যাবাজার এলাকা থেকেই ইট ও কাচের বোতল ছোঁড়ার ঘটনা ঘটেছিল। যা নিয়ে পরবর্তীকালে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। ওইদিনই বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ প্রায় ২৫০টি বাইক নিয়ে কলকাতায় রামনবমীর শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল। পার্ক সার্কাসের সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং দিয়ে মিছিলটি পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগোতে থাকে। সেভেন পয়েন্ট থেকে পার্কস্ট্রিটের দিকে যেতে গিয়ে আটকে পড়ে শোভাযাত্রাটি। সেখানে বেশ কয়েকজন নমাজ আদায় করছিলেন। সেই সময় দুই পক্ষ থেকেই উসকানিমূলক কিছু মন্তব্য করা হয়। তবে পুলিশ গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিল। হাতাহাতি শুরু হলেও পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পর পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে বহু মানুষ বাইক রাস্তায় রেখেই পালান। এদিকে ঘটনায় ৪ জনকে আটক করে বেনিয়াপুকুর থানার

পুলিশ। এরপর পুলিশ সেই এলাকা দিয়ে আর কোনও শোভাযাত্রা যেতে দেয়নি। এই ধরনের যে কোনও শোভাযাত্রা মৌলালি দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এদিকে লালবাজার থেকে মধ্য কলকাতায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

মধ্যপ্রদেশের খারগোনে, ২০২২-এর রামনবমীর শোভাযাত্রায় পাথর মারা হয়, গুলি চলে, কিছু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ চৌধুরীর পায়েও গুলি লেগেছিল। তারপরই একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের বিরুদ্ধে পাথর মারার অভিযোগ রয়েছে, তাদের বাড়ি, দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। ডিভিশনাল কমিশনার পবন শর্মা জানিয়েছেন, মোট ৫০টি জায়গায় এই অভিযোগ চলে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের দাবি, বেআইনি জমির উপর বাড়ি বা দোকানগুলো তৈরি হয়েছিল। তাই তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মোট ৮৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। চারজন সরকারি কর্মী গুজব ছড়ানোর অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান ঘটনার পরেই বলেছিলেন, দাঙ্গাকারীদের ছাড়া হবে না। সরকারি সম্পত্তি নষ্টের খেসারত তাদের দিতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র বলেছিলেন, যারা এই কাজ করেছেন, তাদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হবে। শুধু খারগোন নয়, বারয়ানিতেও একই ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন।

এবার গুজরাটের ভাদোদরায় শোভাযাত্রায় দু'বার পাথর ছোঁড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। গুজরাটের ভাদোদরার ফতেপুরার একটি শোভাযাত্রায় ছোঁড়া হয় পাথর। এরপর সন্ধ্যায় একই এলাকায় আরেকটি শোভাযাত্রা বের হয়। তখনও পাথর ছোঁড়া হয়েছে। পাথর ছোড়ার কিছু ভিডিয়ো সামনে এসেছে। সাধারণ মানুষকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতেও দেখা গিয়েছে। একাধিক শিশু ও নারী ছিল। লখনউয়ে শোভাযাত্রায় বিতণ্ডাও হয়।

উত্তপ্ত হাওড়ার শিবপুরের মতো অশান্ত হুগলির রিষড়াও। সেখানেও ইটবৃষ্টি, গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। শ্রীরামপুরে বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতির গাড়ি ভাঙচুর হয়। আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক। অশান্তির জেরে নিরাপত্তা বিঘ্নিত বিজেপি সাংসদ তথা

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে সাগরদিঘির উপনির্বাচনে সংখ্যালঘুরা শাসকদলের থেকে মুখ ফিরিয়েছে। সেই ভোট পুনরায় এককাট্টা করতেই শাসকদলের দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র।

সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের। যদিও নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁকে সময়মতো ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় বড়ো কোনও বিপদ হয়নি। দিলীপ ঘোষের গাড়ির সামনে ফাটে বোমা। ঠিক সময়ে তাঁকে সেই স্থান থেকে না সরিয়ে আনলে বড়ো কোনও বিপদ ঘটতে পারত বলে বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

'অশান্তি' ডালখোলাতেও। রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হয়েছে উত্তরবঙ্গের ডালখোলায়। একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত একাধিক। জখমদের মধ্যে রয়েছেন ইসলামপুরের পুলিশ সুপার বিশপ সরকার। ওইদিন বিকেলে রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয় দু'পক্ষের। মারা গিয়েছেন এক যুবক। আহত ৫-৬ জন পুলিশকর্মী। পুলিশের বক্তব্য, হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। রাজ্য বিজেপির দাবি, হামলা হয়েছে দিলীপ ঘোষ এবং বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের ওপরেও। এই পরিস্থিতিতে হিংসার ঘটনায় একযোগে এনআইএ তদন্তের দাবি জানালেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, দেবশ্রী চৌধুরী ও জগন্নাথ সরকারেরা। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখন পুরনো কাশ্মীরের মতো। পশ্চিমবঙ্গে বিভাজনের রাজনীতি করছে তৃণমূল। আমরা এনআইএ তদন্তের দাবি করছি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছি।' আরও

একধাপ এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তোলেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত চলছে। এখনই ৩৫৬ ধারা জারি করা হোক।' সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীর বক্তব্য, 'ইসলামপুরে দেশের সব থেকে বড়ো রামনবমীর শোভাযাত্রা হয়। ৩ লক্ষ মানুষ এই শোভাযাত্রায় অস্ত্র গ্রহণ করেন। পুলিশের কথাতেই এবার শোভাযাত্রার রাস্তা বদল করা হয়েছে। আর এখন আয়োজকদের ওপর দোষ চাপানো হচ্ছে। এমন অনেক মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাঁরা শোভাযাত্রায় অংশই নেননি।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ বলেন, রামনবমীর মিছিল কেন ৫ দিন ধরে হবে? বিনা প্ররোচনায় হাওড়া, রিষড়ায় হামলা চালানো হয়েছে। প্রশাসনকে সতর্ক করছি, কোনও সমস্যা যেন না করতে পারে কেউ'। রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে অশান্তির পর রিষড়ার বিভিন্ন এলাকায় চলে টহলদারি। চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে এলাকায় রুট মার্চের পাশাপাশি, প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর জন্য মাইকে প্রচার চালায় পুলিশ। এলাকায় জারি হয় ১৪৪ ধারা। ওইদিন রাত ১০টা পর্যন্ত রিষড়া ও মাহেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার হাওড়ায় কোন পথে শোভাযাত্রা কীভাবে এসেছিল, গণ্ডগোলের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল, তা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে বোঝার চেষ্টা করছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজও শুরু হয়েছে। ৬ সদস্যের একটি তদন্তকারী দল গোটা এলাকা ঘুরেছে। সিআইডি অফিসাররা ঘটনাস্থলে গিয়ে সাধারণ মানুষের বয়ান রেকর্ড করেন। যেসব এলাকায় গোলমাল ও হামলার ঘটনা ঘটে তার ছবি তোলেন। ঘটনাস্থলের ছবি তোলার পাশাপাশি ড্রোন দিয়ে এলাকার পরিস্থিতির উপর নজরদারিও চালানো হয়। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী এবং রাজ্য পুলিশের দুই কর্তা নিশাত পারভেজ এবং রশিদ মুনির খান বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আশ্বস্ত করেছেন।

১ এপ্রিল সকাল থেকেই তদন্তে নেমে পড়েন সিআইডির গোয়েন্দারা। সিআইডির স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-সহ বিভিন্ন শাখার আধিকারিকদের এই তদন্তের কাজে যুক্ত করা হয়েছে। যার নেতৃত্বে রয়েছেন আইজি (সিআইডি) বিশাল গর্গ এবং ডিআইজি (অপারেশনস) সুখেন্দু হীরা। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করার পরই সিআইডি তদন্তের সিদ্ধান্ত নেন। পুলিশ কমিশনারকে নিয়েই সিআইডির দল ফজিরবাজার এলাকা ও পিএম বস্তিতে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান, অগ্নিদগ্ধ গাড়ি পরিদর্শন করে। কী থেকে অশান্তির সূত্রপাত? কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রায় ঢুকে পড়েছিল দুষ্কৃতী? অন্য রুটে কেন ঢুকেছিল শোভাযাত্রা? কোন কোন পুলিশের ওপর কী কী দায়িত্ব ছিল? মূলত এই বিষয়গুলি সিআইডি খতিয়ে দেখছে। সেদিন বন্দুক নিয়ে মিছিলে কেউ কীভাবে অংশ নিল, কারা তারা, কারা অশান্তির মূলে, অশান্তি আটকাতে পুলিশই-বা কী ভূমিকা নেয়, কী ব্যবস্থা ছিল পুলিশের তরফে, তা খতিয়ে দেখছে সিআইডি। বাইরে থেকে কেউ মদত দিয়েছিল কি না, সেটা জানতে ধৃতদের জেরা করার পাশাপাশি সন্দেহভাজনদের মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস রেকর্ড বা সিডিআর নেওয়া হয়।

হাওড়ার জেলাশাসকের দপ্তর থেকে জারি করা হয় বিজ্ঞপ্তি। উসকানিমূলক বার্তা এবং ভিডিয়োর ক্ষেত্রে টেলিকম, ইন্টারনেট এবং কেবল পরিষেবা প্রদানকারীদের নোটিশ জারি করেন হাওড়ার জেলাশাসক মুক্তা আর্য। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী জানান, 'হাওড়ার ঘটনায় মোট ৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিবপুরের আশেপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি আছে। দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে।' দু'দিনে গোলমাল পাকানোর জন্য যে ৩৮ জনকে ধরা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, মারণাস্ত্র নিয়ে হামলা, বেআইনি সমাবেশ, সরকারি কর্মীকে কাজে বাধা দান, সরকারি কর্মীকে মারধর, খুনের চেষ্টা, আগুন লাগানো, মহিলাদের উদ্দেশে সম্মানহানিকর মন্তব্য-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ জন পুলিশ হেফাজতে এবং ২৩ জন জেল হেফাজতে আছে। বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পেট্রোল, অ্যাসিড ও তলোয়ার উদ্ধার করেছেন সিআইডির তদন্তকারীরা। বেশ কিছু হকি স্টিকও উদ্ধার করা হয়। হামলার পর হাওড়ার আইনশৃঙ্খলা সামলানোর দায়িত্বে দেওয়া হয় ১১ জন আইপিএস অফিসারকে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাওড়া পুলিশ কমিশনারের অফিসে গিয়ে একটি সিডি জমা দিয়েছেন তিনি দাবি করেছেন ওই সিডিতে যারা গোলমাল করছে তাদের ছবি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, রমজান মাসে হামলাকারীরা কোনও খারাপ কাজ করতে পারে না। অথচ ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হামলা 'কারা' করেছে।

হাওড়ার শিবপুরে অশান্তির ঘটনায় উদ্বিগ্ন মানবাধিকার কমিশন। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি অন হিউম্যান রাইটস ভায়োলেন্সের তরফে ৬ সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। তালিকায় রয়েছেন আইনজীবী থেকে প্রাক্তন আইজিরাও। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে ঘটনাস্থলে ঢুকতেই দেয়নি রাজ্য পুলিশ। বিভিন্ন অজুহাতে তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে। দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলে ঢুকতে না পেরে কমিটির সদস্যরা হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রশ্ন তুলেছেন, আমাদের আটকাতে পুলিশ যতটা তৎপরতা দেখাচ্ছে, আক্রান্তদের ডাকে তারা তার কণামাত্রও তৎপরতা দেখায়নি। তবে কি ঘটনাস্থলে কমিটির সদস্যরা গেলে কোনো গোপন তথ্য হাতে এসে যাবে এই ভয়েই তাদের ঢুকতে দেওয়া হলো না? কমিটি বিস্তারিত রিপোর্ট লিখে কেন্দ্রের কাছে জমা দিয়েছে। এসবের জবাব খুঁজতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে চলতি বছরের মার্চ মাসে। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে সাগরদিঘির উপনির্বাচনে সংখ্যালঘুরা শাসকদলের থেকে মুখ ফিরিয়েছে। সেই ভোট পুনরায় এককাট্টা করতেই শাসকদলের দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র। □

এপার-ওপার ভাবনা

১৩ মার্চ স্বস্তিকায় প্রকাশিত বিশ্বামিত্রর কলমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই পত্রের অবতারণা।

আন্তর্জাতিক বিচারে বাংলা ভাষার নিয়ামক সংস্থা পূর্বে ছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এর নাম হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'। বাংলাদেশে এর নিয়ামক সংস্থার নাম 'বাংলা একাডেমি'। 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র বাংলা ভাষার শিকড়ে প্রাকৃত; সাহিত্যে সংস্কৃত। ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব সাহিত্যে অনিবার্য। কাজেই সাবেক বাংলা সাহিত্যে সনাতন পরম্পরার ধারণাই প্রধান। পৌরাণিক ভাবধারার আধিক্য সেখানে প্রকট, মঙ্গলকাব্যগুলোই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অপরদিকে বাংলাদেশি বাংলায় তৎসম ও দেশি শব্দের প্রচলন অনেক কম। আরবি, ফারসি, তুর্কি, উর্দু শব্দের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। তাদের গল্প, কবিতায় প্রাধান্য পায় মধ্যপ্রাচ্যের কোনও বীর যোদ্ধা ও প্রেমিক-প্রেমিকার গৌরবগাথা।

বঙ্গভূমির সুস্পষ্ট ইতিহাস যদি ৪-৫ হাজার বছর হয় তবে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস ন্যূনতম তিন হাজার বছর তো হবেই। 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই বাংলা সাহিত্যের পরম্পরা সনাতন ভাবধারায় খ্রিস্টপূর্ব একহাজার বছর আগে থেকে বহমান। কিন্তু বাংলাদেশ তার ইতিহাস গণনা করতে এক হাজার বছরের বেশি পিছিয়ে যেতে রাজি নয়। কাজেই বাংলাদেশের তথাকথিত বাঙ্গালিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের হিন্দু বাঙ্গালিদের একাসনে বসানোর চেষ্টার এই প্রবণতা এক অর্থে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো শুভবার্তা বহন করতে পারে না।

তারপর বঙ্গাব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। বঙ্গদেশে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে (৫৯০-৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও অসম নিয়ে মিলিতভাবে সূর্য সিদ্ধান্ত মতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা দিনপঞ্জিকা বা বঙ্গাব্দ। তারিখটি ছিল ইংরাজি ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১২ এপ্রিল ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ। এই ভাবেই শুরু হয়েছিল ভারতীয় মতে বারো মাসের দিনপঞ্জিকা। কিন্তু মহারাজা শশাঙ্কের আমলে বঙ্গাব্দের সূচনা হলেও পরবর্তী প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী এই অব্দের ব্যবহারের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এর প্রধান কারণ ছিল শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন অব্দেরও সাময়িক বিলয় প্রাপ্তি ঘটেছিল। দেশীয় রাজারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো নতুন নতুন অব্দের দিন গণনা শুরু করে দেন। তারপর মুসলমান শাসনের সময়ে হিজরি সালের ব্যবহার শুরু হয়। দিল্লি সুলতানিয়ত বা মুঘল শাসনের ওই সময় রাজত্ব ও প্রশাসনিক কাজে হিজরি সনই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এতে একটা সমস্যা দেখা দেয়। প্রতি সৌরবছর সেখানে ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিনে হয়, সেখানে ৩৫৪ দিনে একটি চান্দ্র বছর হয়। অর্থাৎ চান্দ্র মাসের হিসেবে হিজরি সালের গণনা হওয়াতে ত্রিশ সৌর বছর সময়সীমার মধ্যে একত্রিশটি হিজরি বছর হয়ে যায়।

তাই সামাজিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মে সুবিধা বিবেচনা করে বাদশাহ আকবর হিজরির পরিবর্তে সৌর বছরের প্রচলন করেন। আকবরের রাজত্বকালের ২৯তম বছরে এই নতুন বছরের দিন গণনা শুরু হয়েছিল। এই দিনটি শশাঙ্ক প্রবর্তিত বৈশাখ মাসের প্রথম দিন, যাকে নওরোজ বা নববর্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই পদ্ধতিতে তারিখ-ই ইলাহি পঞ্জিকা তৈরি হয়। পরবর্তীকালে তারিখই-ইলাহিই বঙ্গাব্দ হিসেবে জনমনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু তারিখ-ই-ইলাহির তারিখ, মাস প্রভৃতি বঙ্গাব্দের সঙ্গে মিলে গেলেও সালগণনায় ভিন্নতা থেকে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে তারিখ-ই-ইলাহির সূচনা হয়েছিল আকবরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার দিন থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। সেই হিসেবে বঙ্গাব্দ ও তারিখ-ই-ইলাহির পার্থক্য ৯৬২ বছরের। এতে এটা সহজেই বলা যেতে পারে, আকবরই মহারাজা শশাঙ্ককে অনুসরণ রেছিলেন— উলটোটা নিশ্চয়ই নয়।

—জহরলাল পাল,
শিলচর, অসম।

ভারত ভাবনার মূলে শ্রীরামচন্দ্র

স্বস্তিকা পত্রিকা ২৭ মার্চ, ২০২৩, প্রচ্ছদ নিবন্ধ ড. জিষ্ণু বসুর 'ভারত ভাবনা ও শ্রীরামচন্দ্র' লেখাটি পড়ে ঋদ্ধ হলাম। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ শাস্ত্রাচারসম্মত নিজেদের দেশ ও সমাজের পরম্পরা বহন করে চলেছে। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁর অওয়াধি ভাষায় রচিত 'রামচরিত মানস' গ্রন্থে রঘুপতি রামের জীবনচরিত পদ্যের মাধ্যমে রচিত করে হিন্দুধর্মকে এক উচ্চ আসনে স্থান করে দিয়েছিলেন।

হনুমান চাল্লিসার মতো সঞ্জীবনী গ্রন্থ সহজ আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করে ভারতবর্ষের প্রতিটি হিন্দু মানুষকে ধর্মের পাঠ শিখিয়েছেন। বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ আধুনিক ভারতের নবজাগরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলন জনজাগরণের বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেই ব্যতিক্রম। পুরাণ ও উপনিষদের শিক্ষা ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে যুগ যুগ ধরে আধ্যাত্মিক সমাজ জীবনকে এক বিশেষ ধারায় চালনাশক্তির প্রেরণা জুগিয়েছে। রাজা রামচন্দ্রের জীবন সমগ্র ভারতবাসীর কছে আদর্শ স্বরূপ। ভারত ভাবনার একেবারে মূলে আছে আধ্যাত্মিকতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রজাবাৎসল্য, যা প্রতি হিন্দুর পরম্পরা।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

ভারতীয় চিন্তনে মা

শতভিষা সরকার

নারী-পুরুষের পতি-পত্নীরূপে বসবাসের স্বীকৃতি হলো পরিবারিক জীবনের মূলভিত্তি। পরিবার সমষ্টি নিয়েই সমাজ। পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু 'মা'। তাই আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিটি পরিবার মাতৃতান্ত্রিক। গার্হস্থ্য জীবনে নারী তিনটি রূপে বিকশিত হন— কন্যা-জায়া-জননী। নারীর এই তিনটি রূপের মধ্যে ভারতীয় চিন্তায় মাতৃরূপই শ্রেষ্ঠ। মাতৃত্বকে শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতীয় ঋষিরা একটি বৈপ্লবিক কার্য নিঃশব্দে সুসম্পন্ন করেছেন। মাতৃত্বের মাধ্যমে নারীকে দেবীত্বে উপনীত করেছেন— 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' ভারতীয় সমাজে মাতৃত্বেই নারীত্বের সার্থকতা। পত্নীত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বকেই ভারতবর্ষ চিরকাল অগ্রাধিকার দিয়েছে, মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

ভারতীয় সমাজ নারীকে জন্মগ্রহণ থেকেই সম্মান জানিয়ে এসেছে। কন্যালাভ আমাদের কাছে লক্ষ্মীলাভ স্বরূপ। আজও আমরা কুমারী পূজা করি। আজও আমাদের একটি বিখ্যাত তীর্থ কন্যাকুমারী। আমাদের বিশ্বাস, কুমারীর মধ্যে আদ্যাশক্তি মহামায়া বিরাজ করছেন। বৈদিক যুগে তো পুত্র-কন্যায় কোনো সামাজিক ভেদ ছিল না। কন্যাদের উপনয়ন সংস্কার হতো। দেবী সরস্বতী আজও উপবীতধারিণী। বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোনো ভেদ ছিল না; সকলেই বিদ্যার্জনের অধিকারী ছিল এবং গুরুগৃহে অন্তেবাসী হয়ে বিদ্যালাভ করতে পারত। কন্যাকে বেদপাঠেরও অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অথর্বসংহিতায় (১১-৫-১৮) বেদ পাঠের ছাত্রী তরুণ বর লাভ করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বৈদিক যুগে নারীরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। নারী-ঋষির প্রতিভার ভিত্তি ছিল তাঁদের শৈশবকালীন শিক্ষাদীক্ষা। সে যুগে দুইরকম শিক্ষিতা নারীর পরিচয় পাওয়া যায়— 'সদ্যোদ্বাহা' ও 'ব্রহ্মচারিণী'। প্রথমোক্ত শ্রেণীর নারীরা বিবাহকাল পর্যন্ত এবং শেষোক্ত নারীরা আজীবন বিদ্যাচর্চা করতেন।

কন্যাকে এইভাবে সুশিক্ষিত করে বিবাহ দেওয়া হতো। ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ থেকে ৮৫ সূক্তের মন্ত্রসমূহ থেকে ভারতীয় বিবাহের আদর্শ সম্পর্কে জানা যায়। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত দলিল, যা থেকে আমরা সভ্য সমাজের বিবাহ প্রথার একটি আদর্শ চিত্র পাই। বৈদিক যুগে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি যে কত উন্নত ছিল এই সূক্তটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। ভারতীয় সমাজে স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী— কী গার্হস্থ্য জীবনে, কী অধ্যাত্ম জীবনে। স্ত্রী ব্যতীত স্বামী কোনো ধর্মীয় কাজ করতে পারতেন না; কিন্তু স্বামী ব্যতীত স্ত্রী নিজেই সকল প্রকার ধর্মকার্য করতে পারতেন। ভারতীয় সমাজে পত্নীর স্থান এমনই উচ্চাসনে অবস্থিত।

তারপর মাতৃত্ব লাভ করলে পত্নীর সামাজিক মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। মায়ের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমাদের শাস্ত্রে মাতাকে সহস্র পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রে রয়েছে— পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপাষণাৎ। অতৌ হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।।

অর্থাৎ গর্ভধারণ ও পালনপোষণের জন্য মাতার স্থান পিতার চাইতেও উঁচুতে। সেজন্য তিনলোকে মাতার সমান গুরু নেই।

জাতিচ্যুত পিতাকে বর্জন করা যায়, কিন্তু মাতাকে কখনো নয়। 'গর্ভধারণাভ্যাং পোষণাভ্যাং তাতান্মাতা গরীয়সী।' শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নীকে মাতৃরূপে পূজা করে তাঁকে আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই মায়ের কাছেই স্বামীজী অহরহ প্রার্থনা করতে বলেছেন— 'মা, আমায় মানুষ করো।' অর্থাৎ মানুষ করার চাবিকাঠিটি কিন্তু মায়ের হাতে।

আজ ভারতীয়রা ছিন্নমস্তা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে মাতৃচেতনা থেকে অপসৃত হচ্ছে বলেই নিত্যনতুন নারী নির্যাতনের ফুলঝুরি জ্বলছে।

এই নির্যাতন আইন করে রোধ করা যাবে না। পুরুষের চেতনায় যদি 'মাতৃবৎ পরদারেষু' শিক্ষা না থাকে তবে প্রত্যহ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হবেই। আজ ইউরোপ-আমেরিকায় নারীকে অনেক ট্যাঁড়া পিটিয়ে পুরুষের সমান অধিকার দিতে চেষ্টা করছে; আর ভারতবর্ষ সেই বৈদিক যুগ থেকে নারীকে মাতৃত্বের মাধ্যমে, দেবীত্বের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। এটিই ভারতীয় সমাজের সাধনা। □

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করার উপায়

ডাঃ আর. এন. দাস

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত ২০০৮ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, সারাবিশ্বে ২৫-এর উপরে ৪০ শতাংশ লোকই উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। আধুনিক যুগের 'নিঃশব্দ-ঘাতক' বলে চিহ্নিত হয়েছে দুটি রোগ— একটি উচ্চ রক্তচাপ, অন্যটি মধুমেহ। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে— অস্বাভাবিক জীবনশৈলীর পরিণাম হলো ওই দুটি ব্যাধি। ভারতে ৫৭ শতাংশ পক্ষাঘাত এবং ২৪ শতাংশ হৃদযন্ত্রে রক্তবহা নালীর অবরোধজনিত মৃত্যুর কারণ হিসেবে উচ্চ রক্তচাপকেই দায়ী করা হয়। চিকিৎসাহীন দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের উপর প্রভূত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। আয়ুর্বেদে উচ্চ রক্তচাপের কোনো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে খ্রিস্ট জন্মের সহস্র বছর আগেই বৈদিক শাস্ত্রগুলিতে শরীরে গুরুতর রোগগুলির মধ্যে, 'রক্তগত বাতদোষের' কথা উল্লেখিত হয়েছিল। আধুনিক যুগের নগর সভ্যতায় মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগের কারণে উচ্চ রক্তচাপ যেন এক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অ্যালোপ্যাথিতে রক্তচাপের দুটি কারণ বলা হয়— মুখ্য বা অজ্ঞাতহেতুজ এবং গৌণ বা আনুষঙ্গিক।

সারাদিন সূর্যকিরণবিহীন নিয়ন-লাইটে আলোকিত অফিসে বসে কাজ, বিলাসবহুল কায়িক পরিশ্রমহীন শহুরে জীবনের মানসিক উত্তেজনা, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও ভিটামিন-ডি বিহীন আমিষ খাদ্য, আর্সেনিকযুক্ত জল, গর্ভনিরোধক পিল, মদ ও ধূমপান, মেদবৃদ্ধি ও স্থূলতা হচ্ছে ৯৫ শতাংশ শহরবাসীর উচ্চ রক্তচাপে মুখ্য কারণ।

ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ প্রকৃতিনির্ভর স্বাভাবিক জীবনশৈলীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে বিগত ২০০ বছরে। যোগাচার্য বাবা রামদেবের কথায় মানুষের ডিএনএ পর্যন্ত অশুদ্ধ ও বিকৃত হয়ে গিয়েছে আজকের যান্ত্রিক জীবনের নিরন্তর সংঘর্ষে। সারাবিশ্বে আজ ১.৩ বিলিয়ন লোক উচ্চ রক্তচাপের শিকার এবং প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন ব্যক্তি উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে ধমনী ও হৃদযন্ত্রের ব্যাধিতে মারা যায়। উন্নত দেশগুলিতে মৃত্যুর প্রধান কারণই হচ্ছে রক্তচাপ ঘটিত হৃদযন্ত্রের বিকৃতি। এমনকী ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেও ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুসারে ১৫ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২.৫ মিলিয়ন ভারতীয়ের উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির রক্তচাপ ১৪০/৯০-এর বেশি হলেই তার চিকিৎসা শুরু করতে হবে। স্নায়ুর উদ্দীপনায়

অ্যাড্রিনালিন নামক হরমোন রক্তবহা ধমনীগুলিকে সংকুচিত করে এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির স্টেরইড হরমোন রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে জলের বেশি অবশোষণ ঘটিয়ে রক্তের আয়তন বৃদ্ধি করে উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি করে। উচ্চ রক্তচাপকে সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল করা যায় না। তবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে। সময় মতো উপচার না করলে উচ্চ রক্তচাপের কারণে মস্তিষ্কের রোগ অর্থাৎ পক্ষাঘাত এবং চোখ ও কিডনির বিভিন্ন রকমের রোগের সৃষ্টি হয়। অ্যালোপ্যাথির ওষুধগুলি শুধু মহার্ঘ্যই হয় না সেগুলি মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি করে। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনশৈলীর পরিবর্তন ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করে এই মহামারীর প্রকোপ থেকে অকালমৃত্যুকে সহজেই প্রতিহত করা যায়।

প্রতিরোধ সবসময়ই উপচারের থেকে বেশি ফলদায়ক হয়। তাই উচ্চ রক্তচাপের পূর্বাবস্থা অর্থাৎ ১২০-১৩৯/৮০-৮৯ চিকিৎসকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরাও বলেন, জীবনশৈলী ও খাদ্যাভ্যাসের সামান্য পরিবর্তন করে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। শরীরের ওজন ও মধ্যভাগের মেদ কমানো, দৈনিক খোলা আকাশের নীচে ব্যায়াম, বেশি পরিমাণ জল, ফল ও শাকসবজি সমেত নিরামিষ খাওয়া, মদ ও নেশা মুক্তি, ধূমপান বর্জন, তেল, ঘি, ভাজাভুজি আর মিষ্টি বর্জন করা উচিত। যদি সপ্তাহে মাত্র ৫ দিন ৩০ মিনিট দৌড়ানো বা জোরে হাঁটা যায় তাহলে মেদ-সহ ওজন, শর্করা, কোলেস্টেরল, রক্তচাপ, হৃদরোগ ও পক্ষাঘাতের শতকরা হার কমে যায়। দীর্ঘজীবন ও মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। চিকিৎসকরা বলেন, ওজন কমানোর সূচক, বি.এম.আইকে ২৫-এর নীচে রাখা, রক্তে সুগার খালিপেটে ১০০ ও খাবার দু' ঘণ্টা পরে ১৫০ মিলিগ্রাম এবং কোলেস্টেরল ২০০ মিলিগ্রামের মধ্যে রাখলে অকালে পক্ষাঘাত ও হৃদযন্ত্রের আক্রমণ থেকে বাঁচা যাবে।

আয়ুর্বেদ ও যোগে সাত্ত্বিক আহারের কথা বলা হয়েছে। গীতার ১৭ অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকের উপদেশ, 'আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য, সুখপ্রীতি বিবর্ধনাঃ। রস্যাস্নিগ্ধাস্থিরাহৃদ্যা, আহারা সাত্ত্বিকা প্রিয়াঃ।। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, সাত্ত্বিক আহারে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। স্মৃতি শুদ্ধ হলে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলি খুলে গিয়ে দয়া, করুণা মৈত্রীতে পূর্ণ হয়। সাত্ত্বিক বা যৌগিক খাদ্য শুদ্ধ ও নিরামিষ হয়। তাতে অহিংসা মানে প্রাণী হত্যার কোনো স্থান থাকে না। সেজন্য কথায় বলে, 'যেমন অন্ন, তেমনই মন; যেমন পানি, তেমনই বাণী'। সাত্ত্বিক খাদ্যে থাকে পলিফেনল ও পটাসিয়াম, যা আসে ফলমূল ও শাকসবজি থেকে, অবশ্য যদি সেগুলি প্রকৃতির সান্নিধ্যে, প্রাকৃতিক উপায়ে ও স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন করা হয়। শুদ্ধ মনে ও সৎ ভাবে যদি খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন করা হয় তবে খাবারে সাত্ত্বিকতার ভাব ফুটে উঠে। আয়ুর্বেদের ভাষায়, এইরকম খাদ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয় প্রাণ ও আধ্যাত্মিক শক্তি। সাত্ত্বিক খাদ্যের গুণবত্তা পরীক্ষা করা হয় ধ্যানের মাধ্যমে। তামসিক খাদ্য গ্রহণ করলে ধ্যানের সময় নিদ্রা আসে। ধ্যানের মধ্যে মাত্রাধিক ক্রিয়াশীল মনের উপস্থিত থাকলে তা রাজসিক খাদ্যের প্রভাব বলে মানা হয়। সাত্ত্বিক খাদ্য খেলে মন শান্ত হয়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, সজাগ মন গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধান করতে সক্ষম হয় এবং অচিরেই আত্মদর্শন লাভ হয়।

হঠযোগ প্রদীপিকাতে, যোগীর উপযুক্ত সাত্ত্বিক খাদ্যের মধ্যে বলা হয়েছে, ভাত, রুটি, মুগ ডাল, মধু, শাকসবজি, পেঁপে ও আপেল জাতীয় ফল, শুদ্ধ জল, শর্করা, দুধ, দই, ঘি ও মাখন। সাত্ত্বিক খাবার হয় শুদ্ধ, হালকা, টাটকা, তাজা আর সুমিষ্ট। শাকসবজি ও ফলের মধ্যে থাকে অধিক মাত্রায় পলিফেনল, ক্ষার পদার্থ এবং পটাশিয়াম যা সোডিয়ামকে প্রতিস্থাপন করে রক্তচাপের মাত্রা কমায়। তাছাড়া সাত্ত্বিক খাদ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও কোলেস্টেরল কম পরিমাণে ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট বেশি পরিমাণে থাকে। এতে অচিরেই রক্তচাপ কমে যায়। পক্ষান্তরে, রাজসিক খাদ্যের মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন, চা, কফির মতো উত্তেজক পদার্থ, অধিক মশলা আর জাঙ্ক বা ফাস্ট ফুডে বেশি পরিমাণে লঙ্কা, লবণ ও অ্যাসিড থাকে। এসব খাদ্য খেলে রক্তের আয়তন বৃদ্ধি পায় আর রক্তবহা ধমনীগুলি সংকুচিত হয়ে উচ্চরক্তচাপের সৃষ্টি করে। তাই বৈদ্যের দৃষ্টিতে এগুলি বর্জনীয়। যোগীদের অনুপযুক্ত ও নিষিদ্ধ খাদ্য হচ্ছে রাজসিক ও তামসিক খাদ্য। আয়ুর্বেদ বলা হয় তামসিক খাদ্য ভারী, শুকনো, উচ্ছিস্ট, বাসি, পচা, দুর্গন্ধযুক্ত, ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা খাবার, মদ, মাছ বা মাংস— এগুলি খেলে নির্ঘাত রোগ উৎপন্ন হবে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বেশি জল ও ক্ষারজাতীয় পদার্থ খেলে রক্তের ঘনত্ব কমে, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল ও সুগারকেও কম করে দেয়। আমাদের মুনিঋষিরাও পটাশিয়ামযুক্ত সেঁধা লবণ খেতেন। আজও পূজা-পার্বণে মা-মাসিদের সেঁধা লবণ দিয়ে তৈরি ভোগ রান্নার পদ্ধতি গ্রামেগঞ্জে প্রচলিত আছে। হিন্দু সমাজে সহাস্রাধিক বছরের ইন্টারমিটেন্ট উপবাস ও বেশি জল খাওয়ার প্রথা আজও বহাল আছে।

জাপানি জীববিজ্ঞানী ইয়োসিনোরি ওহসুমি, ২০১৬ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পান ওই ইন্টারমিটেন্ট উপবাস ও অটোফেজির উপর গবেষণা করেই। মুনিঋষিদের জীবনকালও তাই সুদীর্ঘ হতো। কাশীর পদ্মশ্রী প্রাপ্ত ১২৬ বছরের শিবানন্দ বাবা আজও বেঁচে আছেন শুধুমাত্র সাত্ত্বিক আহার, প্রাণায়াম ও যোগাসনের শক্তিতে। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সুক্রোজ সমৃদ্ধ বেশি মিষ্টি খেলে নাইট্রিক অক্সাইডের অভাবে ধমনী সংকুচিত হয়ে রক্তচাপ বাড়ায়। তাই ফ্রুটি জাতীয় কৃত্রিম ফলের রস, কেচাপ, সোডা, স্প্যাগাট্টি, টিনজাত রাসায়নিক পদার্থযুক্ত ফল ও শাকসবজি বর্জন করে রক্তচাপকে সহজেই নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

হাওড়ায় আক্রান্ত রামনবমীর শোভাযাত্রা

সঞ্জয় মুখার্জি

গত ৩০ মার্চ রামনবমী উপলক্ষ্যে হাওড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অঞ্জনীপুত্র সেনা দ্বারা আয়োজিত বিশাল শোভাযাত্রা হাওড়ার মানুষ প্রত্যক্ষ করলো। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বি.ই. কলেজ ১ম গেট থেকে দুপুর ৩টের সময় রের হয়ে কাজিপাড়া হয়ে জিটি রোড ধরে ধীরে ধীরে তাদের পূর্ব নির্ধারিত পথ ধরে এগোচ্ছিল। পথের দু' ধারে অগণিত মানুষ এই শোভাযাত্রা দেখার জন্য আশেপাশের বাড়ি, মহল্লা, গলির ভেতর থেকে এসে জড়ো হয়েছিল। গেরুয়া পতাকায় পুরো রাস্তার দু' ধার ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমন কোনো বাড়ি ছিল না যেখানে 'জয় শ্রীরাম' লেখা পতাকা লাগানো ছিল না। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে পতাকা, মাথায় জয় শ্রীরাম লেখা ফেট্টি বাঁধা ছিল আর মুখে ছিল জয় শ্রীরাম ধ্বনি। সে যেন হাজার হাজার মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। শোভাযাত্রায় একটা লরিতে কয়েকটি বক্সে একসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের গান বাজছিল। একটা পালকিতে রামলালা চলেছে। ঘোড়ার গাড়িতে চলেছেন শঙ্কর মঠের মঠাধীশ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, অন্য একটি ঘোড়ার গাড়িতে অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে রাম, সীতা, হনুমান শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলেছে। কয়েকজন মহিলা ঢাকি নাচতে নাচতে ঢাক বাজাচ্ছিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। বঙ্গ সংস্কৃতিতে রাম যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হাওড়ার মানুষ চাক্ষুষ করল দু' নয়নভরে।

ছন্দপতন ঘটল শোভাযাত্রা জিটি রোডের অলকা সিনেমা পার করার পরেই। হাওড়া জুটমিলের কাছে হঠাৎ দুম দুম করে বোমার শব্দ আর একের পর এক পাথর, ইট, কাঁচের বোতল পড়ার শব্দ হতে লাগলো। বেশ কয়েকজনের মাথা থেকে রক্ত ঝরতে দেখা গেল। আমি হাওড়া জুটমিলের পাশের একটি ফ্ল্যাটের ছাদে দেখলাম একদল মুসলমান যুবক নীচে শোভাযাত্রাকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর কাঁচের বোতল ছুঁড়ছে একের পর এক। আশেপাশের বহু মানুষ ভয়ে যে যেদিকে পারছে দৌড়োচ্ছে। আমাকে একজন ভদ্রমহিলা বললেন আপনি গলির ভেতরে চলে যান ওখানে থাকবেন না, মুসলমানরা পাথর, ইট, কাঁচের বোতল ছুঁড়ছে। তার পরেই কয়েকটি ফলের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুনের লেলিহান শিখায় শোভাযাত্রা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আকাশ কালো ধোঁয়ায় ভরে গেল। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে শোভাযাত্রার লোকেদের মারতে শুরু করলো। বেশ কিছু যুবক পুলিশের সামনে চিৎকার করতে লাগলো যারা ইট, পাথর ছুঁড়ছে, আগুন লাগাচ্ছে, আমাদের কার্যকর্তাদের মারছে তাদের গ্রেপ্তার না করে আমাদের মারছেন কেন?

পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি চালিয়ে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে দিল। আমরা কয়েকজন হাওড়া ময়দানে রামনবমী সমারোহ সমিতির অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। সেখানে রাম-সীতা-হনুমানের মূর্তি সকাল থেকে হোম-যজ্ঞ পূজা তার সঙ্গে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড পাঠ হচ্ছে। সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম রামরাজাতলার শঙ্কর মঠের মঠাধীশ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর প্রবচন চলছে। তারপর কয়েকজন মিলে একসঙ্গে গানের সঙ্গে আরতি দেখলাম। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তাহলে রামনবমী উৎসব কেন সবার হলো না। সশস্ত্র মহরমের তাজিয়া যদি হিন্দু এলাকা দিয়ে যেতে পারে তাহলে হিন্দুদের শোভাযাত্রা কেন নির্বিঘ্নে যেতে পারবে না। রাজ্যের শাসক দল এবং প্রশাসন পূর্বপরিকল্পিতভাবে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার নোংরা খেলায় মেতেছে। হিন্দুরা ক্ষোভে ফুঁসছে। শাসকদলের প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েই হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল— ইন্দ্রদেব দুবে

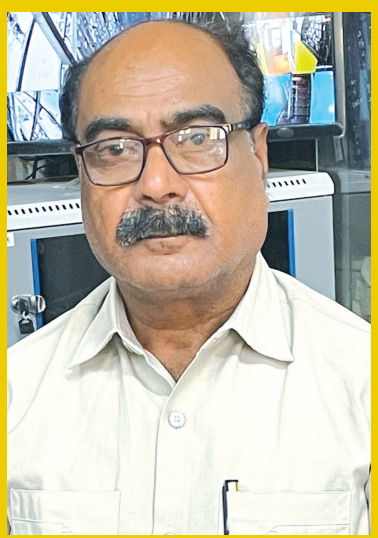

৩০ মার্চ, ২০২৩। হাওড়ার সংখ্যালঘু এলাকায় পিএম বস্তিতে আক্রান্ত হয় রামনবমীর শোভাযাত্রা। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলছে অভিযোগ-পালটা অভিযোগের পালা। শাসকদল বহিরাগত তত্ত্ব উসকে দিয়ে অভিযোগের আঙুল তুলেছে শোভাযাত্রার আয়োজক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দিকে। যাবতীয় তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেই অভিযোগ খণ্ডন করলেন সংগঠনের হাওড়া মহানগরের আহ্বায়ক ইন্দ্রদেব দুবে। সাক্ষাৎকার নিলেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি ভবানী শঙ্কর বাগচী।

□ রাজ্য সরকারের তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে, গত ৩০ মার্চ হাওড়ায় যে রামনবমীর শোভাযাত্রা যাচ্ছিল তার কোনো অনুমতি আপনাদের কাছে ছিল না?

● **ইন্দ্রদেব দুবে :** এটা পুরোপুরি মিথ্যে কথা। আমার কাছে সমস্ত ডকুমেন্ট আছে। রিসিভ কপি থেকে শুরু করে ছাড়পত্র পর্যন্ত। আমরা ৩ মার্চ হাওড়া কমিশনারেটের সিপি'র কাছে শোভাযাত্রার অনুমতি চেয়ে আবেদন করি। তাছাড়া হাওড়ার এই শোভাযাত্রা নতুন নয়। বিগত ১০ বছর ধরে আমরা এর আয়োজন করে আসছি। একই রাস্তা দিয়ে, প্রশাসনের গাইডলাইন মেনে, নানারকম বিধিনিষেধ পালন করে আইনকানুন মেনেই এই শোভাযাত্রা করা হয়েছে। তার জন্য ৩ মাস আগে থেকে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি।

শোভাযাত্রা শুরু হয় শিবপুর বিই কলেজ ফার্স্ট গেট থেকে। ওই এলাকার থানা, ছ' কিলোমিটার পথের মধ্যে যে যে থানা পড়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত থানাকে জানানো হয়েছে। এমনকী শোভাযাত্রার পথে শালিমার স্টেশনের ৩ নম্বর গেটের যে রেললাইন সংলগ্ন এলাকা পড়বে সেটা মাথায় রেখে স্টেশন ম্যানেজার, আরপিএফ, জিআরপিএফ-দপ্তরেও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চিঠি দিয়ে জানিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে রেলযাত্রীদের বা রেল প্রশাসনকে কোনোরকম অসুবিধায় না পড়তে হয়।

□ তার মানে আপনি বলছেন আপনাদের কাছে রামনবমীর শোভাযাত্রার প্রপার অনুমতি নেওয়া ছিল?

● **ইন্দ্রদেব দুবে :** হ্যাঁ, আমাদের কাছে প্রপার অনুমতি নেওয়া ছিল। কোন কোন পথ দিয়ে শোভাযাত্রা যাবে, কীভাবে যাবে তার রুটম্যাপও প্রশাসনের কাছে আমরা জমা দিয়েছি। কত সংখ্যা থাকবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তত চারবার আইপিএস র‍্যাংকের অফিসাররা আমাদের সঙ্গে বসেছেন। তিনটে থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক আমাদের সঙ্গে বসে মিটিং করেছেন। আমাদের গাইড করেছেন। তাঁদের কথা মতো আমরা শোভাযাত্রার সময় পর্যন্ত পরিবর্তন করেছি। আমরা বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সময় চেয়েছিলাম। কমিশনারেট থেকে বলা হয়েছিল দুপুর ১ টার সময় শোভাযাত্রা শুরু করতে। কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্মের কোথাও দুপুরবেলায় পুজোআচ্চা হয় না। তখন তাঁদের তরফে দুপুর আড়াইটের সময় দেওয়া হয়। আমি তাঁদের অনুরোধ করে বলেছিলাম, ঠিক আছে তাই হবে। তবে, মা-বোনেরা অনেক দূর থেকে আসেন, তাঁরা পুজোয় অংশ নেন। পুজোর ব্যাপার, দশ-পনেরো মিনিট দেরি হতে পারে। ওখানে এসিপি-সহ সমস্ত আইপিএস অফিসার, স্থানীয় পদস্থ পুলিশ অফিসাররাও ছিলেন। মৌখিকভাবে তাঁরা সম্মতি জানিয়েছিলেন। আমরা ৩টের মধ্যে শোভাযাত্রা শুরু করে দিয়েছিলাম।

□ তা সত্ত্বেও অভিযোগের তির আপনাদের দিকে কেন?

● **ইন্দ্রদেব দুবে :** যতবার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছে ততবারই আমি হাতজোড় করে অনুরোধ করেছি যে ৬ কিলোমিটার শোভাযাত্রার মধ্যে মাত্র ১০০ মিটার পিএম বস্তি এলাকাটা আপনারা আমাদের বাড়তি নিরাপত্তা দিন। গোটা পরিক্রমা পথের আর কোনও এলাকা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ নেই, শুধুমাত্র এই ১০০ মিটার এলাকা কভার করে দিলেই হবে। আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী, আমরা উচ্ছৃঙ্খল নই। বিশ্বজুড়ে আমাদের সংগঠনের

কাজ চলে। ৮০ দেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাজ করছে। কোথাও কোনো অভিযোগ নেই। আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে। আর প্রভু রামের শোভাযাত্রায় আমাদের সমর্থকরা আইন ভাঙবে, তার প্রশ্নই ওঠে না। প্রত্যেকবার মিটিঙে ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ সেন্ট্রাল এবং সাউথ, তিনটে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ছিলেন। কী স্লোগান হবে, কী ব্যানার হবে সেটাও তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন। আমরা সেটাও জমা দিয়েছি। আমাদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে গৈরিক পতাকা ছাড়া কিছু ছিল না।

□ তার মানে ৬ কিলোমিটার পরিক্রমা পথের মাত্র ১০০ মিটার আপনারা যথোপযুক্ত নিরাপত্তা চেয়েছিলেন পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। কেন বিশেষভাবে ওই ১০০ মিটারেরই আবেদন করলেন?

● **ইন্দ্রদেব দুবে :** কারণ গতবার ওই নির্দিষ্ট এলাকাতেই আমাদের শোভাযাত্রায় পাথর ছোঁড়া হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই আহত হয়েছিলেন। শোভাযাত্রা আটকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তো ঘরপোড়া গোরু। তাই গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই প্রশাসনের কাছে মিনতি করেছিলাম। বলেছিলাম, আপনারা ছাদগুলোর উপর ফোর্স বসান। কারণ গতবার সংঘ্যালঘু অধ্যুষিত ওই বাড়ির ছাদগুলো থেকে পাথর ছোঁড়া হয়েছিল।

□ সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল?

● **ইন্দ্রদেব দুবে :** সেদিন আমরা বিই কলেজ ফার্স্ট গেট থেকে যাত্রা শুরু করলাম। খুব সুশৃঙ্খলভাবে শোভাযাত্রা এগোচ্ছিল। মা-বোনেরা, ভাইয়েরা, কর্মী-সমর্থকরা সবাই আনন্দ করতে করতেই যাচ্ছিলেন। রেললাইন ক্রস করেছি, বেতাইতলা বাজার, সান্তা সিংহ মোড় হয়ে কাজিপাড়া পেরিয়ে এসে শিবপুর বাজারে আমাদের শোভাযাত্রা থমকে গেল। আমি শিবপুর ওসিকে ফোন করলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 'বড়োবাবু আমাদের র‍্যালি এগোচ্ছে না কেন? আমাদের নির্ধারিত সময়ে সাড়ে চারটেতেই শিবপুর বাজারে পৌঁছে যাবার কথা। অথচ আমরা ট্রাম ডিপোর কাছেই আটকে আছি।' তিনি বললেন সামনে আর একটা র‍্যালি আছে।

এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। আমরা এনআইএ তদন্তের দাবি করছি।

অথচ আমাদের কাছে ওই একই সময় অন্য র‍্যালির কোনও তথ্য ছিল না। আমাদের বলাও হয়নি। বড়োবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলার পুরো রেকর্ডিং আমার কাছে আছে। যাইহোক, দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকার পর যেই আমরা শিবপুর থানা থেকে একটু এগিয়েছি মাথায় জাল টুপি ও লুঙ্গি পরা কিছু লোক ও বাচ্চা ছেলে আমাদের উপর বোতল, পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। তার কিছুক্ষণ পরেই চার-পাঁচশো লোক রাস্তায় এসে জড়ো হয়। একটা রথ ছিল যেখানে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা সেজে ছেলে-মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল। ওদের আক্রমণ করা হলো। আমরা রথ-সহ সবাইকে নিয়ে শিবপুর থানায় যাই। আমাদের দেখে থানার গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি অনুরোধ করি মহিলাদের অন্তত থানার ভেতরে আশ্রয় দিন। দাঙ্গাবাজরা মারমুখী হয়ে তেড়ে এল। থানা লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে। অথচ পুলিশ নীরব দর্শক দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করলো। কিন্তু অদ্ভুতভাবে যারা শোভাযাত্রায় হামলা চালাচ্ছে তাদের দিকে না ছুঁড়ে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের অভিমুখ ছিল আমাদের শোভাযাত্রার দিকেই। একদিকে হামলাকারীরা বোতল, পাথর ছুঁড়ছে, আরেক দিকে টিয়ার গ্যাস, কোনোরকমে আমরা মা-বোনেদের বাঁচিয়ে ওখান থেকে বের করে আনি। তারপর আমরা আর এগোতে পারিনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের সঙ্গে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও হামলাকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জটুকুও করেনি, উলটে আমাদের ওপরই পুলিশ লাঠি চালিয়েছে।

□ তার মানে আপনি বলছেন, আপনারা অভিযোগ করার পরেও পুলিশ বা প্রশাসন আপনাদের সাহায্য করেনি?

● **ইন্দ্রদেব দুবে :** না, কেউ আমাদের কোনও সাহায্য করেনি। তাঁরা নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মনে হয় তাঁরা কোনোদিন এই ধরনের শোভাযাত্রা কভার করেননি। গতবারের মতো এবারেও শিবপুর থানা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবছরের নিরাপত্তা আরও খারাপ হয়েছে।

□ শাসকদলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আপনারাই শোভাযাত্রায় বাইরে থেকে লোক এনেছিলেন। তারাই পাথর ছুঁড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মতে পাথর ছোঁড়া এ রাজ্যের সংস্কৃতি নয়। কী বলবেন?

● **ইন্দ্রদেব দুবে :** পিএম বস্তির যে বাড়িগুলো থেকে পাথর বোতল ছোঁড়া হচ্ছিল সেখানে নিশ্চয় আমাদের বহিরাগত লোক ছিল না। ব্যাপারটা কি এতই সহজ? একটা মুসলমানদের বাড়ির ছাদে আমাদের ছেলেরা উঠে যাবে কেউ প্রতিরোধ করবে না। তাছাড়া আজকালকার দিনে লুকিয়ে ছুপিয়ে কি কিছু করা যায়? সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, ড্রোন ক্যামেরা আছে। সমস্ত ফুটেজ আছে। ন্যাশনাল মিডিয়াগুলোতে সব দেখানো হয়েছে। এবার কি বলবেন মিডিয়াও বাইরের লোক? ৩১ মার্চ শুক্রবার দুপুরের পর যারা ১৪৪ ধারার মধ্যেই হিন্দু এলাকায় এসে আমাদের ওপর আক্রমণ করল তাদেরও কি আমরা বাইরে থেকে এনেছিলাম? এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। আমরা এনআইএ তদন্তের দাবি করছি। এখনো পর্যন্ত আমাদের প্রায় একশোরও বেশি পরিবার ঘরছাড়া। আমাদের নির্দোষ ছেলেদের অ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছে। উলটে কোথা থেকে একটা বন্দুকধারীর ছবি নিয়ে বাজার গরম করা হচ্ছে। আমার তো মনে হয় আমাদের শোভাযাত্রায় পিএফআইয়ের কিছু লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব পরিকল্পিতভাবে।

রামনবমীতে আক্রমণ হয় কারণ তা মোল্লাবাদের পরিপন্থী

হিন্দুধর্ম পালন এবং অনুকূল ধর্ম সংস্কৃতির পরিকাঠামো কিছুতেই দিতে চায় না এই রাজ্য সরকার।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

সোশ্যাল মিডিয়ায় একখণ্ড ছবি অনেকবার ঘুরতে ফিরতে দেখা গেছে। এক টুকরো বইয়ের পাতার ছবি। বইটির নাম 'কলিকাতা সেকালের ও একালের'। হিন্দু ও মুসলমানের পরবের তালিকা তাতে আছে এবং বাঙ্গলায় ১১৯৪-তে রামনবমী একদিন ছুটি যোগে পালিত হয়েছিল; সেই বাঙ্গলাতেই আজকের রামনবমীর মিছিলে পাথর ছোঁড়া হয়। দুষ্কৃতীদের আক্রমণ শোভাযাত্রার সমান্তরালে যায়। এ রাজ্য অনেকবার নানান ঢঙের সাম্প্রদায়িক অসুহিষ্ণুতা দেখল। ২০১৬-র ধুলাগড় থেকে দেগঙ্গা, ২০১৭-র বাদুরিয়া থেকে হাজিনগর, বা বাদ যায় কেন জলঙ্গি কিংবা মেদিনীপুরের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। কখনও তেলেনিপাড়া তো কখনও খিদিরপুর— সবই ছোটো ছোটো ঘটনার দলেই রয়ে গিয়েছে। এর আগেও যখন হাওড়াতে (১০ জুন ২০২২) অঙ্কুরহাটি, রানিহাটি, উলুবেড়িয়াতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধে, যখন নূপুর শর্মার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে কার্যত তাণ্ডব চালায় জেহাদি দুষ্কৃতীরা, সেদিনও শিবপুর বাজার বন্ধ ছিল। গা থমথমে হাওড়ার হাওয়া। পথচারী প্রায় ছিলই না। তবুও তাকে দাঙ্গার তকমা দিল না রাজ্য সরকার। এবার তবে কী জবাব ও অজুহাত দেবে রাজ্য সরকার? সেই হাওড়াতেই রামনবমীর শোভাযাত্রা ক্যারিরোডের কাজিপাড়া এলাকা রণক্ষেত্র চেহারা নেয়। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। মিছিলে ছোঁড়া হয় কাঁচের বোতল, পাথর। ফুটপাতের স্টলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে যাদের রক্ত সঞ্চালন অস্থির হয় সেই জেহাদিরা ১৫ জন রামভক্তকে আহত করে।

কতকগুলি খুব স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা সবারই আছে। প্রথমত, পুলিশকে

রিষড়ায় শোভাযাত্রায় আক্রমণের শিকার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ।

শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, রুট পারমিশন ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, সন্ধ্যা বাজার এলাকাতে শোভাযাত্রা ঢুকতেই আচমকা আক্রমণ শুরু। কী করল পুলিশ প্রশাসন? কী পদক্ষেপ নিল? ক'জন দুষ্কৃতীকে আটক করল? এমন অসংখ্য সাধারণ জিজ্ঞাসা সবারই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এর জন্য স্বাভাবিক প্রতিবর্তক্রিয়াই যথেষ্ট। খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় না উপরিউক্ত 'কী ও কেন'গুলোর জন্য। এর পরের প্রশ্নই উঠুক— মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন! স্বয়ং তিনিই তো বলেছিলেন দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দেবেন না। কে দাঙ্গাকারী? যারা আক্রান্ত হলো তারা! নাকি আক্রমণকারীরা। নিন্দনীয় এই ঘটনার পর একজন পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, ওরা বুলডোজার নিয়ে মিছিল করছে। এটা খুব পরিষ্কার, মুসলমানদের তোষণ করার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের অপবাদ দিতে একটুও পিছপা নন এ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এক পুলিশ আধিকারিক বলেছেন--- আমরা যথাযথ অ্যাকশান নিয়েছি। হ্যাঁ নিয়েছেন, ঠিক যা যা অ্যাকশান নিলে দুষ্কৃতীদের সেফ প্যাসেজ করে দেওয়া যায় এবং রামভক্তদের এটা ওটা সেটা বলে গতি স্থিমিত করা যায়, আতঙ্কের পরিমণ্ডল তৈরি করা যায়; ঠিক তাই করেছেন তাঁরা। রামনবমীতে এবার শোভাযাত্রা যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী ছিল। হিন্দুত্ব যে এখন আর সেকুলারিজমের শীতঘুমে থাকতে রাজি নয় তা প্রতিভাত। হিন্দুদের এই জাগরণ, স্বাভিমানের পদক্ষেপ, ধর্ম রক্ষার ঐক্যবদ্ধতা সব মিলিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটলেই তখন তা মমতা ব্যানার্জির যুক্তিতে হয়ে ওঠে বহিরাগতদের ভিড়। রাজনৈতিক স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুত্ববাদী ঐক্য ও উদ্যোগ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তাদের বারংবার সেকুলারিজমের ঘুমবড়িতে শান্ত রেখে, চুপিসারে চলেছে মুসলমান তোষণ। কে চিন্তিত? মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে সাগরদীঘি উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর মনে করাই যায় একচ্ছত্র মুসলমান ভোটব্যাংক হাতছাড়া হতে চলেছে তৃণমূলের। টের পাওয়া যাচ্ছে শুধুমাত্র তোষণের রাজনীতিতে চিড়ে ভিজবে না। বাম-কংগ্রেস-সিদ্দিকির দল সবাই মিলে মুসলমান ভোটব্যাংকে জোরালো থাবা বসাতে পারে। তাই এবার তৃণমূলের উলটো খেলা। সরাসরি হিন্দুবিরোধী কিছু আচরণের মধ্যে দিয়ে মুসলমান ভোটব্যাংকের ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে মরিয়া।

সব অলংকারে ভূষিত তৃণমূল— তা সে চাকরি কেলেঙ্কারি হোক কিংবা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দুর্নীতি। মমতা বিরোধী হাওয়া এতটাই দমকা যে সাগরদিঘির মতো মুসলমান অধ্যুষিত বিধানসভা আসনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট স্যুইং করেছে ২৮ শতাংশ! যে আসনে বিগত তিন বিধানসভা ভোটে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তৃমমূল। তার মানে ২৯৪টা আসনেই মমতা ব্যানার্জির মুখ, নাম, ইমেজ, ভাষণ, তোষণ একজোটে একযোগে ক্রিয়াশীল নয়। এর আগেও ২০১৮-তে রথযাত্রা হোক কিংবা দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন— সব ক্ষেত্রেই মহামান্য কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। কমিউনাল কার্ড এই রামনবমীতে ভিন্ন ধাঁচে খেলল রাজ্য সরকার। যেখানে সাম্প্রদায়িক সুস্থতা অবনমনের দায় চাপানো হচ্ছে হিন্দুদের উপর। একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিল ২০২২-এর লক্ষ্মী পুজোর রাতে। যেদিন মোমিনপুর ইকবালপুরের হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চলেছিল। ঘরছাড়া হয়েছিল ১০০ হিন্দু। অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণের চিহ্ন পাওয়া যায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে। তবুও একটা বারের জন্যও উচ্চারণ করা হয়নি— হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছে। এবার রামনবমীর মিছিলও ঠিক তেমনই।

জেহাদিদের তৃণভূমি পশ্চিমবঙ্গ, তাদের তাণ্ডব প্রশ্রয় দিলেই মুসলমান ভোট হস্তগত হয়। এতদিন তোষণে, তোষামোদের ওষুধ ব্যালটে ভালোই ফল দিচ্ছিল। কিন্তু সেকুলার পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্বের এমন বহিঃপ্রকাশ যেন এক উতল হাওয়া। একদল বাঙ্গালি আজ স্মরণ করছে ঋষি অরবিন্দকে। যিনি উত্তরপাড়া ভাষণে বলেছিলেন, 'সনাতন ধর্মই আমাদের কাছে রাষ্ট্রবাদ। এই হিন্দু রাষ্ট্রের উদয় হয়েছিল সনাতন ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে এবং তার বৃদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্র বর্ধিত হয়। এই রাষ্ট্রের যখন ক্ষয় হয়, হিন্দু রাষ্ট্রেরও তখন ক্ষয়। আর সনাতন ধর্ম যদি কোনোদিন বিনষ্ট হয়, তাহলে সনাতন ধর্মের সঙ্গেই এই রাষ্ট্র বিনাশপ্রাপ্ত হবে।' ধর্ম ও রাষ্ট্রহিতে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি যখন ক্রমশ একজোট হচ্ছে, তখন তা সেকুলার বাঙ্গলার আরাম ঘুম ভাঙিয়ে দেখিয়ে দেয় সেকুলারিজমের সরলীকরণ করলে চলবে না। বাঙ্গালি নিজেকে আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত করতে পারে না। সেকুলার শব্দের নামে, তোষণের নামে অনেক জরিমানা দিয়েছে হিন্দুরা। রামনবমীর দুর্বার বেগ তারই পালটা দান।

রামনবমীর শোভাযাত্রা প্রমাণ করল 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। কোথায় গন্তব্য বাঙ্গালি হিন্দুদের? তারা একবার দেশ ছেড়েছে। আর তো নয়। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। তাতো মমতার তোষণ রাজনীতিতে ম্রিয়মাণ হতে পারে না। তাই যখনই রামনামে শোভাযাত্রা হয় তখনই এ রাজ্যের রাজনৈতিক মদতপুষ্ট জেহাদি শক্তির বিশৃঙ্খল উত্তেজনা ধরা পড়ে। অদ্ভুত ভাবে তার ওপর কোনও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন না সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা এবং অধিকাংশ ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়া। হিন্দুদের এই জাগরণ মেনে নিতে পারে না জেহাদিরা। তারা অমুসলমান কাফেরদের বিরুদ্ধে সবরকম শক্তি প্রয়োগ করে। তাই রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর বর্বরতা হয়। রামভক্তদের নিগ্রহ করা হয়। জেহাদিদের নগ্ন অত্যাচার আগ্রাসন ধরা পড়ার সম্ভাবনাতে নিরোধ দান করে তৃণমূল দল।

এ রাজ্যে যে ইসলামিক জেহাদিরা সগৌরবে বিরাজ করছে তার প্রমাণ লাগাতার সিএএ, এন আর সি বিরোধিতা, তিনতালাক বিরোধী আইনের বিরোধিতা। এ রাজ্যে যখন ক্রমশ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসার লাভ করছে তখন হঠাৎ করে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ আবার উদ্ভাসিত। হিন্দুত্ববাদী চিন্তা ক্রমশ স্থান দখল করছে। তাই রামনবমীর ওপর এত আক্রমণ।

রামনবমী একটা দিন কেবল নয়। এই শোভাযাত্রায় অনুরণিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই হিন্দুরাষ্ট্র সত্তার ধ্বনি 'আমি হিন্দু' তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার কর্তব্য...।' রামনবমী জাতি মঙ্গলের সেই কর্তব্য পালন করে যা হিন্দুদের একজোট করার হেতু একমতালম্বী। তাই মমতার শাসনে যখন 'ল্যান্ড জেহাদ' বাড়বাড়ন্ত তখন রামনবমী শোভাযাত্রায় আক্রমণ আকস্মিক হলেও বিস্ময়কর নয়। পশ্চিমবঙ্গ যে জেহাদি শক্তির আঁতুড়ঘর তার সদ্য প্রমাণ সল্টলেকের কম্পিউটার কর্মীর বিস্ফোরকের ব্যবসা। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে এপ্রিলের শুরুতেই যখন বীরভূমের মুরাইয়ের বাসিন্দা মীর মহম্মদ আসাদুজ্জামান বিকাশভবন চত্বর থেকে গ্রেপ্তার হন। তখন জানা যায় গত ৩১ জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার হওয়া রিন্টু শেখের কাছে ২৭ হাজার কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পায় মীর মহম্মদ। এ রাজ্যে একাধিকবার ডিটোনেটর, জিলাটিন এবং নানান জটিল রাসায়নিক বিস্ফোরকের সন্ধান মেলে। সেসব খবর কোথাও গিয়ে জলভাত। যতক্ষণ না খাগড়াগড়ের মতো কিছু ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসন স্বীকার করবে না, প্রচেষ্টাও করবে না। এরই নাম সাইলেন্ট কমিউনালিজম। এ রাজ্যের শাসক দল জেহাদি শক্তিকে চটাতে চায় না। তাই রাজ্য পুলিশ সচরাচর এই মীর মহম্মদদের তল্লাশি করেও পায় না। মনে করতেই হচ্ছে ১২ ডিসেম্বর ২০১৬-র ঘটনা। পিছিয়ে দেখতেই হচ্ছে— তোষণ রাজনীতির প্রমাণ সন্ধানে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নারী দিবসের দিনে শুভেচ্ছা বার্তা দেন, 'Hazrat Muhammad is the torchbearer of world peace, justice and Human welfare।'

জেহাদিরা যখন ধুলাগড়ে শান্তি মিছিলের নামে বোমা পিস্তল লোহার রড নিয়ে মিছিল করল, স্থানীয় কিছু মানুষ প্রতিবাদ করলে ১১টার বেশি দোকান ভাঙচুর চলল, চলল আরও অত্যাচার, সেদিনও তাদের নিন্দা করেনি শাসক দল। সাঁকরাইলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পর ক্ষতিগ্রস্ত ঘরছাড়া হিন্দুরা ইকবাল শেখ, ফিরোজ শেখ, বিলাল শেখ ও মুর শেখের নামে এফআইআর করতে চাইলে তাও যখন প্রত্যাখ্যাত হয় তখন অনুমান করাই যায় আজকের বিস্ফোরক- সহ মীর মহম্মদ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা উদাহরণ নয়। বরং এ রাজ্যের শাসক দল ও জেহাদি প্রীতির এক Random উদাহরণ, একখণ্ড ছবি।

যেখানে জেহাদি শক্তির বাড়বাড়ন্ত তার বিরুদ্ধে একটাও শব্দ ব্যয় না করা রাজ্য সরকার হঠাৎ করে বিহারের মুঙ্গের থেকে এক যুবককে (সুমিত সাউ) গ্রেপ্তার করল। এই সেই ছেলে যার হাতে নাকি রামনবমীর দিন হাতে বন্দুক ছিল। রামনবমীর বিশৃঙ্খলার পর তড়িঘড়ি মুঙ্গের থেকে এক যুবককে পাকড়াও করা হলো, তাকে বিজেপির লোক বলে ট্যাগ দেওয়াতে এক মিনিটও বিলম্ব হলো না। কিন্তু ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অশান্তি করা, তাতে মদত দেওয়া, পাথর ছোঁড়া আসল ব্যক্তিদের অধরাই রাখা হয়। এনামুলদের ধরতেই পারে না রাজ্য পুলিশ।

শেষমেশ একটা জিজ্ঞাসা থেকেই যাবে। ২০১৭-র বসিরহাটে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছিলেন সমাজের যুবদের নিয়ে রাজ্যে ৬০ হাজার নির্বাচনী বুথভিত্তিক শান্তিবাহিনী তৈরি করা হবে যারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দমন প্রশমন করবে। কোথায় সেই বাহিনী? তারা কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে বোঝে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার সংঘটিত করা? তাই হিন্দুধর্ম পালন এবং অনুকূল ধর্ম সংস্কৃতির পরিকাঠামো কিছুতেই দিতে চায় না এই রাজ্য সরকার। ■

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ১ এপ্রিল কলকাতায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনের প্রেক্ষাগৃহে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সিএএ এবং এনআরসি-র গুরুত্ব। বক্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন প্রদীপ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী। বক্তব্য রাখেন আইনজীবী সৌরভ বাসু, সঞ্জয় সোম, ডাঃ অর্চনা মজুমদার। সভা পরিচালনা করেন ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ এবং ধন্যবাদ জানান অমিতাভ সেন।

সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে বিশ্ব অটিজম দিবস উদ্‌যাপন

গত ৬ এপ্রিল সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে উত্তর কলকাতার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সত্যেন্দ্রনাথ ভবনের সভাকক্ষে বিশ্ব অটিজম দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়, সহ সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম, জোকা ইএসআই হাসপাতালের ডাঃ অরুণাভ কুণ্ডু এবং বিশিষ্ট সাইকোলজিস্ট ডাঃ সুনন্দা ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অনীক ব্যানার্জি। ভারতমাতা, ভক্ত সুরদাস ও অষ্টাবক্রমুনির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন দিব্যাঙ্গ ভগ্নী অদিতি মজুমদার। মঞ্চস্থ সকলেই তাঁকে পুষ্পস্তবক ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী দিয়ে অভিনন্দন জানান। স্বাগত বক্তব্যে ডাঃ ব্রহ্ম দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের জন্য সরকারি সহায়তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সক্ষম যে সাতটি প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে দিব্যাঙ্গদের জন্য কাজ করে চলেছে তার বিস্তারিত উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল সক্ষমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। ডাঃ অরুণাভ কুণ্ডু তাঁর বক্তব্যে দিব্যাঙ্গদের প্রতি সমাজের সহমর্মিতার ওপর জোর দেন। ডাঃ সনন্দা ব্যানার্জি প্রাঞ্জল ভাষায় অটিজম বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ সাত্যকী দাসকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনজন মা দিব্যাঙ্গ সন্তান প্রতিপালনে মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার যুবপ্রমুখ বিশিষ্ট শিশুবিশেষজ্ঞ ডাঃ সাত্যকী দাস। সমাপ্তি বক্তব্য রেখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে বেঙ্গল ইন্টান্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

গত ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে 'বাংলা আবার' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে। প্রথম দিনের মুখ্য অতিথি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আনন্দ বোস তাঁর বক্তব্যে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর বিশ্ববিজয়ের বছরে তাঁর চলচ্চিত্রপরিচালক জীবনের নানান অনুপ্রেরণার প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে প্রবাদপ্রতিম বাংলা চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও তরুণ মজুমদার, যাঁদের উদ্দেশে উৎসবটি নিবেদিত, তাঁদের চলচ্চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষতা ভারতীয় চলচ্চিত্র মহলকে যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাও জানান। অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিমাংশ শেখর খাটুয়া এই অনুষ্ঠানকে সুদূর অমেরিকার বোস্টন শহর থেকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য প্রবাসী ভারতীয় কাঞ্চন ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য জীবনকৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয় সাবিত্রী চ্যাটার্জি, মাধবী মুখার্জি, রণজিৎ মল্লিক ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে।

অনুষ্ঠানের চারদিনই ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের সঙ্গে কয়েকটি বড়ো চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ওয়েভ ক্যাম্পের মাধ্যমে আমেরিকা প্রবাসী কাঞ্চন ব্যানার্জি ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানকে আরও বর্ণময় করে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সঞ্চমিত্রা চৌধুরী।

উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে লক্ষাধিক মানুষের শোভাযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা স্বপন মুখার্জি ও ডা: সুরেন্দ্র জৈন।

ধর্ম জিজ্ঞাসা— আট

মহাজনের পথই ধর্মের পথ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

মহাজনের পথই পথ। বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই বলেছিলেন যুধিষ্ঠির। আর সেখানেই জিজ্ঞাসা, হিন্দু ধর্মের ভিত্তি তো শাস্ত্র। সেখানে শাস্ত্রই পথ হওয়া উচিত। আলাদা ভাবে মহাজনের কথা তাহলে বলা হলো কেন? এই কেন'র উত্তরটাই অন্যভাবে তুলে ধরে হিন্দুধর্মের এক বৈশিষ্ট্যকে।

একদিক থেকে ধর্ম ও শাস্ত্র— দুই-ই অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। অদ্ভুত এক রহস্যে ঘেরা তা। সাধারণ মানুষের তাই ধর্মতত্ত্বটি বোঝার ক্ষেত্রে পদে পদে হতে পারে ভুল। সেই ভুলের ফলে ধর্মচ্যুত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে বহু সময়ই। আর সে কারণেই মহাজনদের পথ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে।

মহাজন কারা? যাঁরা ধার্মিক, সাধুপুরুষ, তপস্বী, পণ্ডিত— তাঁরাই মহাজন। মনু প্রভৃতি মহাজন পদবাচ্য। বাংলা সংকুচিত অর্থ সুদে টাকা খাটানোর কারবারিরাও মহাজন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই মহাজনদের কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, ধর্মের প্রকৃত মর্মগ্রাহীদের কথা।

কিন্তু তিনি হঠাৎ 'মহাজন' কথাটি ব্যবহার করলেন কেন? উত্তরে বলা যায়, যাঁরা ধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, যাঁরা জেনেছেন এবং বুঝেছেন ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্যের কথা— তাঁরাই তো ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা হতে পারেন। তপস্যার মাধ্যমে যা শিখেছেন তাঁরা, সেই অভিজ্ঞতাতেই তো পথ দেখাতে পারেন তাঁরা। যেমন গণিতকে যাঁরা গুলে খেয়েছেন অর্থাৎ কৃতবিদ্য গণিতজ্ঞরাই তো ছাত্রদের সামনে গণিতের রহস্যের দুয়ার খুলে দেন। জটিল অঙ্ককেও জলের মতো সহজ করে বোঝাতে তো পারেন তাঁরাই। তারাই তো গণিতের মহাজন। একই কথা

খাটে ধর্মের মহাজনদের ক্ষেত্রেও। তাই তো যুধিষ্ঠিরের ওই উক্তি।

গণিত শিক্ষকরা ছাত্রের মেধা ও জ্ঞানের পরিধির কথা মাথায় রেখে ক্রমে ক্রমে গণিতের গভীর তত্ত্বগুলির রহস্য উন্মোচন করেন। মহাজনরাও তাই। সাধারণের মতো করেই তাঁরা বলেন ধর্মের কথা। ব্যাখ্যা করেন শাস্ত্রের নানা জটিল তত্ত্বকে। এবং এসব ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বচনের আক্ষরিক অর্থ নয়, অন্তর্নিহিত বিষয়টিকেই তুলে ধরেন নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোয়। সেক্ষেত্রে শাস্ত্রবচনের আক্ষরিক অর্থ নয়, তার ব্যঞ্জনা এবং প্রকৃত মর্মের কথা বলেন তাঁরা। ওই আলোচনার সত্রেই কখনো কখনো আচারিত কিছু কিছু বিষয়ের পরিবর্তনও করা হয়। এবং এর থেকেই সিদ্ধান্তে আসা যায়, হিন্দুধর্ম কোনো অনড় জড় বস্তু নয়। যুগের প্রয়োজনে মহাজনরা মানুষের স্বার্থেই এবং ধর্মাচরণের পথটি সুগম করতেই সংস্কারের পথ নেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

শাস্ত্রকার মনুর কথাই ধরা যাক। আধুনিক পণ্ডিতরা বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে মনু রচিত স্মৃতিগ্রন্থটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের কোনো এ সময় রচিত বলে অনুমান করেছেন।

মনু সংহিতার তৃতীয় তথা ধর্মসংস্কার প্রকরণটির একটি নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে অনুমান করা হয়, মনুর সময় বা তার আগে সমাজে পণপ্রথা চালু ছিল। কিন্তু এই প্রথা যে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, এটা বুঝেছিলেন মনু। তাই তিনি কঠোর ভাবে নিন্দা করেছেন এই প্রথার। বলেছেন, পণ নেওয়া আর সন্তানকে বিক্রি করা তো একই কথা। বাবা-মা কি তাঁদের সন্তানকে পণ্য মনে করেন, তাকে বিক্রি করতে চান?

এই ধরনের প্রশ্ন তুলেই মনু সমাজে পণ গ্রহণটা একরকম অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। বলেন, গোবধ এবং সন্তান বিক্রয়— দুই-ই সমান উপপাতক। লোভ বা মোহের বশে কন্যা বা ভগ্নীর স্ত্রীধন ইত্যাদি ভোগ করে যেসব পুরুষ তাদের অধোগতি হয়। এমনই উল্লেখ আছে মনু সংহিতায় (৩/৫১-৫২)।

মনু সংহিতার এই নির্দেশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের শাস্ত্রকাররা কোনো সময়েই কোনো একটি আচরণ বিধিকে একবারে পাহাড়ের মতো স্থির বলে মনে

করতেন না। যুগ এবং সমাজের প্রয়োজনে যখনই দরকার পড়তো তখনই নীতি বা আচার বিষয়ের বদল ঘটাতেন। দরকারে কোনো কোনো আচারকে একেবারে নিষিদ্ধ করতেন। হিন্দুধর্মের এ ধরনের নমনীয়তা অবশ্যই তার এক বৈশিষ্ট্য।

তা বলে এমন নয় যে, ধর্মের মূল তত্ত্বকে শাস্ত্রকাররা একবারে বাতিল করে দিতেন। পরিমার্জন বা সংস্কার এবং সম্পূর্ণ রহিত করা যে এক জিনিস নয় এটাও ধর্মচর্চার সময়ে সকলের মনে রাখা দরকার।

হিন্দুধর্মে প্রথম থেকেই সত্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মের আচার্যদের প্রতি মুহূর্তের নির্দেশ— 'সত্যম্ বদ'— সত্য বলবে। কিন্তু একই সঙ্গে সেই সত্যের স্বরূপ সম্পর্কেও সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যা ভাষণ বা সত্যের অপলাপ অবশ্যই গর্হিত অপরাধ। এমনকী সত্য বললে যদি নিজের প্রাণ বিপন্নও হয়, তাহলেও সত্যকে আঁকড়ে থাকার কথা বলা হয়েছে শাস্ত্রের বিভিন্ন নির্দেশে।

কিন্তু সেই সত্যকথনের জন্য যদি অন্যের প্রাণ সংশয় হয় অথবা অন্যকে চরম বিপদে পড়তে হয়, তাহলেও কি সত্য কথাটিই বলতে হবে? এ প্রশ্নের একটাই উত্তর— না। কেননা সত্য প্রকাশের কারণে অপরের প্রাণ গেলে সেটা হবে হত্যার মতোই অপরাধ। এক্ষেত্রে সত্যকে আড়াল করাটা অপরাধ নয়, এটা একদিক থেকে প্রকৃত ধার্মিকেরই কাজ। মনু সংহিতায় (৪/১৩৮) খুবই স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, সত্য কথা বলবে, কিন্তু তা প্রিয় বা মঙ্গলজনক হওয়া দরকার। মর্মভেদী বা যা লোকের ক্ষতি করে এমন সত্য বলতে নেই। তা বলে লোকের ভালো লাগবে বলে তোষামোদির মতো অন্যায় পথ অর্থাৎ সত্য গোপন করার পথটাও ধর্ম নয়।

বেদ নির্দেশিত এই ধর্মপথ বা সত্য-নিষ্ঠার প্রতি জোর দিয়ে মনুসংহিতায় (৪/১৩৯) পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, অভদ্রস্থলেও ভদ্র কথাই বলতে হয় এবং সেটাই হবে প্রকৃত সত্যের অনুসরণ। সকলের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের মঙ্গল কামনা করা উচিত। একই ভাবে সম্পূর্ণ অকারণে কারও সঙ্গে শত্রুতা অথবা বিবাদ করাও উচিত নয়।

মনুসংহিতায় সত্য ভাষণ এবং সুভদ্র ব্যবহার করার এই যে নির্দেশ তা মহাভারতে আরও প্রাঞ্জল, আরও সরাসরি বলা হয়েছে। মহাভারতের কর্ণপর্বে এক অদ্ভুত সংকটের মুখোমুখি হলেন অর্জুন। মহাযুদ্ধের একটা সময় কর্ণের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রায় বিধ্বস্ত অর্জুন মধ্যমপাণ্ডব ভীমকে কিছুটা অরক্ষিত রেখেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিবিরে চলে আসেন। দাদা যুধিষ্ঠিরকে এসে জানান সব।

যুধিষ্ঠির কিন্তু অর্জুনকে উত্তেজিত করার জন্যই তাকে অত্যন্ত ভীরু বলে ভর্ৎসনা করলেন। বসলেন এক মর্মভেদী কথা, 'তুমি যদি না পার তাহলে ওই গাণ্ডীব ধনুক এখনও ধরে রেখেছো কেন? ওই গাণ্ডীব তুমি বরং অন্য কাউকে দাও।'

যুধিষ্ঠিরের একথায় প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠেন অর্জুন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, কেউ তাঁকে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করতে বললে তিনি তাকে হত্যা করবেন। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেই কথা বলায় নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অর্জুন হাতে খড়্গ তুলে নেন যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করার জন্য।

সেই সময় অর্জুনকে ধিক্কার জানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তুমি ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বটাই তুমি জানো না। তুমি এখন যা করছ, কোনো ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি কোনো সময় এমন কাজ করতেন না।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় থমকে যান অর্জুন। অর্জুনের ওই অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ কিছুটা ধমক আর উপদেশ দেওয়ার ছলেই বলেন, অহিংসা পরম ধর্ম। আমার মতে বরং মিথ্যা কথাও বলা যায়, কিন্তু প্রাণীহিংসা করা কখনই উচিত নয়। অথচ এই মহাসমরে শত্রু সেনাদের সংহার করে তুমি সেই অধর্মের কাজই করছ। কিন্তু তার জন্য তো তোমার মধ্যে কোনো গ্লানি দেখা যাচ্ছে না। তাহলে হঠাৎ এখন এমন ধর্মবোধ জেগে উঠল কেন তোমার?

শোনো অর্জুন, আজ তোমাকে কিছু কথা বলছি। সাধুরা অর্থাৎ সত্যপরায়ণ সৎ মানুষরা সবসময় সত্য কথা বলেন। সত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠও আর কিছু নেই। কিন্তু এই সত্যের তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। সত্য কথা বলাটা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এমন অবস্থাও মাঝে মাঝে আসে, যখন মিথ্যাটাই সত্য স্বরূপ, সত্যটাই মিথ্যা হয়ে দেখা দেয়, তখন মিথ্যা কথা বলাটা দোষের নয়। দেখ, সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে যে সত্যপালন করছি বলে কিছু করতে যায়, সে নেহাতই অর্বাচীন, বালক। যে সত্য ও অসত্যর প্রকৃত মর্মার্থ জানে সেই ধর্মজ্ঞ। সেই প্রকৃত সত্যব্রতী।

অর্জুন তখন কিছুটা শান্ত। সেই মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শোনান এক পুরাকাহিনি। বলেন, এক সময় এক জায়গায় বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল। একই সময় সেখানে এক তপস্বী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিল, নাম যার কৌশিক। সাধারণ দৃষ্টিতে ওই দুজনের মধ্যে একজন ক্রূর জীবহত্যাকারী, অন্যজন সত্যবাদী, তপোনিষ্ঠ। এই দু'জনের জীবনকথা শুনলেই বুঝতে পারবে, ধর্মের স্বরূপ কতটা রহস্যে ঘেরা। শোনো সে কাহিনি।

শ্রীকৃষ্ণ বলে চলেন, ব্যাধ হলেও বলাক ছিলেন সত্যবাদী এবং অসূয়াশূন্য। বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। তাঁদের ভরণপোষণের জন্যই বলাক কেবল মৃগবধ করতেন। অকারণ পশুহত্যা করতেন না কোনো সময়েই।

নিত্যদিনের মতো সেদিনও শিকারের সন্ধানে বনে গেছেন বলাক। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শিকার করার জন্য একটি হরিণেরও দেখা পেলেন না তিনি। শিকার চাই, নাহলে যে পরিজনদের অনাহারে থাকতে হবে। তাই বনের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে থাকেন বলাক।

অবশেষে প্রায় শেষবেলায় একটি শিকার নজরে এল। অপূর্ব দর্শন এক হিংস্র পশু একমনে জলপান করে চলেছে এক জলাশয়ে। সেই শ্বাপদের অঙ্গশোভায় বলাক মোহিত। কিন্তু সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন শ্বাপদটি দৃষ্টিহীন। প্রবল ঘ্রাণশক্তির অধিকারী। দূর থেকে গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারত তার শিকারের অবস্থান এবং

হত্যা করত তাকে।

আসলে এই শ্বাপদটি আগে তপস্যা করে অনায়াস পশুহত্যা করার বর পেয়েছিল। বর পেয়ে উন্মত্ত সেই শ্বাপদ কারণে অকারণে পশুহত্যা শুরু করলে বিধাতা তাকে অন্ধ করে দেন। তবে চোখে না দেখেও সে যাতে তার উদরপূরণের জন্য পশুহত্যা করতে পারে তার জন্য তার ঘ্রাণশক্তি দেন বাড়িয়ে। ফলে পশুনিধন সে চালিয়েই যেতে থাকে।

বলাক সেই পশুকে দূর থেকে তির ছুঁড়ে হত্যা করেন। আর তখনই ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার। ওই হিংস্র পশুটি নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে শুরু করে। অপ্সরারা সমধুর কণ্ঠে গীতবাদ্য শুরু করে। সেই সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে আসে রথ ব্যাধ বলাককে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সত্যবাদী বলাক নিজের কুলধর্মে স্থির থেকে এবং অকারণ প্রাণী বধকারী ওই হিংস্র জন্তুটিকে হত্যা করে বনের পশুদের জীবন নিরাপদ করার পুণ্যে হলেন স্বর্গবাসী।

এবার শোনো তপস্বী কৌশিকের কথা। ব্রাহ্মণ কৌশিক বাস করতেন গ্রামের বাইরে এক নদীসঙ্গমে। সত্যভাষণ ছিল কৌশিকের বৈশিষ্ট্য। সত্যবাদিতার জন্য তিনি ছিলেন সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সম্মাননীয় মানুষ। সত্যব্রতী বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন তিনি। যদি কখনও সত্যর কথা উঠত, তাহলে সকলের আগে কৌশিকের নামই করা হতো। এক কথায় তিনি ছিলেন সকলের আদর্শ।

সেদিন কৌশিক বসে আছেন তাঁর কুটিরে। এমন সময় কয়েকজন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ তাঁর সামনে দিয়ে ছুটে পাশের বনের মধ্যে চলে যায়। তাদের পেছন পেছন তাড়া করে আসছিল একদল ডাকাত। তারা কৌশিককে জিজ্ঞেস করে এই পথে কয়েকজন মানুষকে পালাতে দেখেছেন কি? কোন দিকে গেল তারা?

ডাকাতদের প্রশ্নের মুখে কৌশিকের মুহূর্তের দ্বিধা। তারপরই স্থির হন সিদ্ধান্তে। তিনি আজীবন সত্যাবাদী। সত্য-সাধনই তাঁর সাধনা। কখনোই সেই সাধনার পথ থেকে সরে আসেননি। আজও সেই সত্যের পথেই থাকবেন তিনি। তাই ডাকাতদের দেখিয়ে দেন সেই ভয়ার্ত মানুষদের চলে যাওয়ার পথটি। বলেন, ওই বনের দিকেই ছুটেছে তারা।

দ্রুত ছুটে যায় ডাকাতরা সেই বনের পথে। একটু পরেই শোনা যায় আর্তনাদ। ডাকাতের হাতে নিহত হয় অসহায় মানুষগুলি। লুটের মাল নিয়ে চলে যাওয়ার সময় ডাকাতরা কৃতজ্ঞতা জানায় কৌশিককে। তিনিও সত্য বলার আনন্দে আত্মহারা। তাঁর জন্য যে কতকগুলি অসহায় মানুষের প্রাণ গেল সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই তাঁর।

তাঁর ভ্রূক্ষেপ না থাকলেও বিধাতা কিন্তু ক্ষমা করলেন না তাঁকে। অত সাধনা, অত সত্যপথে থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর তাঁকে নিক্ষেপ করা হলো নরকের আগুনে।

কাহিনি দুটি বলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বুঝলে সখা, ধর্মের তত্ত্ব কত জটিল। আসল কথাটি কী জান, ধর্মের প্রকৃত রূপটি সম্পর্কে মাঝেমধ্যেই কিছু সন্দেহ দেখা দিতেই পারে, জাগতে পারে কিছু জিজ্ঞাসা। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সেই সন্দেহ দূর করা বা জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার জন্য যেতে হবে প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে। অল্প বিদ্যা নিয়ে যাঁরা পুঁটি মাছের মতো অল্প জলে ফড়ফড় করেন তাঁদের কাছে গেল প্রকৃত উত্তর তো পাওয়া যাবেই না বরং সবকিছু গুলিয়েও যেতে পারে।

এটা সত্যি, সব কিছুর মতোই কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম তা নির্ণয়ের জন্য কিছু লক্ষণের ওপর অবশ্যই জোর দিতে হবে। কিন্তু কেবল লক্ষণ নয়, অনেক সময় অনুমান বা বিশ্লেষণের মাধ্যমেও ধর্মাধর্মের বিচার করতে হয়। কিন্তু সেই অনুমান সকলেই করতে পারেন না। তার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার। যেমন শ্রুতিকেই অনেকে প্রমাণ বলে মনে করেন। কিন্তু শ্রুতিতে তো ধর্মতত্ত্বের সবকথা নির্দিষ্ট ভাবে বলা নেই। সেখানে তো অনুমানেরই আশ্রয় নিতে হয়।

অহিংসাই ধর্ম। হিংসা নিবারণের জন্যই ধর্মের সৃষ্টি। প্রাণীদের ধারণ বা রক্ষা করে বলেই তাঁর নাম ধর্ম। অর্থাৎ যা প্রাণীদের রক্ষা করে সেটাই ধর্ম। অন্যকে আনন্দ দেওয়া বা তুষ্ট করাকে অনেকে ধর্ম বলে মনে করেন। সেই ধারণা থেকেই তাঁরা অন্যের জিনিস হরণ করেন। এমন মানুষের সঙ্গে কখনো মিশতে নেই। কেউ যদি হত্যা করার জন্য কারো খোঁজ করে তাহলে চুপচাপ থাকাই উচিত। যদি কিছু বলতেই হয় সেক্ষেত্রে মিথ্যে বলাটাই সঙ্গত। এক্ষেত্রে মিথ্যাটাকে সত্যি বলে গণ্য করা হয়। সত্যি বলার জন্য অন্যের জীবন গেলে ওই সত্যবাদীকে কিন্তু কৌশিকের মতো অন্তিমে নরক ভোগ করতে হয়।

অর্জুনকে ধর্মের এইসব গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার পর শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এবার তুমিই ঠিক করো অর্জুন, তোমার সত্য বা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করা উচিত কিনা?

অর্জুন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পেয়ে শেষে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ নেন। বলেন যাতে দুদিক বজায় থাকে সেরকম একটা কিছু তুমিই ঠিক করে দাও।

অর্জুনের একথায় 'সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না' এমন একটি পথের সন্ধান দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বললেন, তোমাকে হতমান করার জন্য যুধিষ্ঠির গাণ্ডীব পরিত্যাগ করতে বলেননি। কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাকে প্ররোচিত করতেই তিনি ওই কথা বলেছিলেন। তাই তাঁকে হত্যা করা উচিত নয় কখনোই। অন্যদিকে তোমার শপথও রক্ষা করা উচিত। দেখ, এজগতে মানী ব্যক্তির মানই জীবন, মানহানিই মরণ। তাই তুমি এই মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরকে অপমান করো। সেটাই হবে তাঁর মৃত্যুর শামিল। এতে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষাও হবে, যুধিষ্ঠিরও জীবিত থাকবেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই অর্জুন তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় দাদাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন। তাতেই মানহানি হয় যুধিষ্ঠিরের। আর অর্জুনও তাঁর পায়ে পড়ে বারবার ক্ষমা চাইতে থাকেন। এতেই তাঁর জ্যেষ্ঠকে অপমান করার পাপস্খালন হয়। আর ওই সঙ্গে জগৎ শোনে ধর্মের এই অপরূপ ব্যাখ্যার কথা। জানা গেল, হিন্দুধর্মে মানবজীবনের লক্ষ্য কীভাবে নির্দেশিত হয়েছে। কীভাবে জীবন ও মৃত্যুর এক অভিমত ব্যাখ্যা রয়েছে হিন্দুধর্মে। □

সর্বরোগহর একাদশী ব্রতের উপকারিতা

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

পুরাণ-সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে উপবাসের ব্রত পালনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মত হলো, উপবাস ক্রিয়া মানব শরীরের ভারসাম্য স্থির রাখার একটি সঠিক ও আসল পদ্ধতি। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে এই জগতে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে ত্রিতাপের অধীনস্থ থাকতে হয়। ত্রিতাপের মধ্যে একটি হচ্ছে ব্যাধি অর্থাৎ জরা, যা ঈশ্বর সাধনায় বিঘ্নস্বরূপ। তা থেকে মুক্তি পেতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ধন্বন্তরী নানাবিধ পদ্ধতি বলেছেন। এই সব পদ্ধতির মধ্যে আছে 'একাদশীর উপবাস ক্রিয়া'। একাদশীর উপবাস করলে শরীর নীরোগ ও মন শুদ্ধ হয়। যেমন সুগার, প্রেসার, থাইরয়েড, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, সেরিব্রাল, মানসিক অবসাদ ও মারণ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। সেজন্য প্রাচীনকালে রোগব্যাধির প্রতিরোধক একাদশীর উপবাস ব্যবস্থা ছিল।

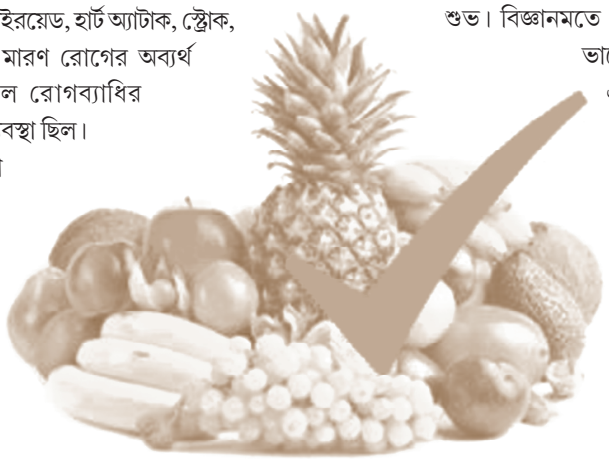

জাগতিক দুঃখ-কষ্ট হলো আমাদের অবাঞ্ছিত বাসনা, সততার অভাব, অহংকারের ফল। তাই অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা। সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত অর্থাৎ নিজ স্বার্থের নেশায় উন্মাদ। নীতিহীনতার যুগে সর্বত্রই দুর্নীতি। ভোগবাদী সমাজে জীবনের নেশায় আমরা বেঁহুশ। ভোগসর্বস্ব স্বার্থপর ব্যস্ত জগৎ। তন্ত্রশাস্ত্র মতে আমরা পোশাক পরা ভদ্র পশু। সমাজে প্রকৃত মানুষ দুর্লভ, আমরা ধর্মান্ধ ও ধর্মত্যাগী মানুষ। সর্বশাস্ত্রের সার গীতার প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে— 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র সকল প্রকার ধর্ম ও কর্ম এই দেহরূপ ক্ষেত্র দিয়েই সম্পন্ন হয়'। জ্ঞানেই ধর্ম, কর্ম ও শক্তি। সর্বশেষ জ্ঞানেই পুণ্য হয়। কিন্তু জগতে কর্ম ও কর্মফলের বাইরে কিছুই হয় না। অথচ শরীরও মন্দির, স্বাস্থ্য রক্ষাও ধর্ম। একাদশীর ব্রত পালন আদতে স্বাস্থ্য বিধির আরাধনা। এই ব্রত বিজ্ঞানসম্মত। সেজন্য এই ব্রত সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষকে দুর্বল করে না অথচ যে কোনও রোগব্যাধিকে প্রতিহত করতে পারে। অর্থাৎ এই ব্রত রোগব্যাধির মুক্তির জন্য অপরিহার্য। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্।

মহর্ষি গর্গ বলেছেন— 'একাদশীতে কিছু খেলে কোনও দোষ হয় না, কিন্তু চাল, গম জাত দ্রব্য ও শস্যদানা নিষেধ— (দ্র: গর্গ সংহিতা)। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন— 'খই-দুধ খাবে' (দ্র: কথামৃত)। যাঁরা একাহারী কিংবা কেবলমাত্র দিন ও রাত্রে একবার আহার করেন, অন্য সময় কিছু খান না তাঁরা উপবাসী— ভীষ্মদেব (দ্র: মহাভারত, অনু-১৩)। পুরাণ সমেত বিভিন্ন শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশীর ব্রত পালনের উপবাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এই সুকঠিন ব্রতের দিন সাধক জল পর্যন্ত গ্রহণ করবে না। যদিও স্নান আচমন ইত্যাদি বিষয়ে জল ব্যবহার চলবে। একে বলা হয় 'নির্জলা' ব্রত। দ্বিতীয়ত, শরবত, দুধ, ডাবের জল ইত্যাদি ব্রতধারী গ্রহণ করতে পারেন। একে বলে 'উপবাস' ব্রত। তৃতীয়ত, শুধু রাত্রিতে ফলাহার যদি হয়, তবে তাঁকে 'নক্ত ব্রত' বলা হয়। চতুর্থত, উপবাসের দিনে যে কোনও সময় যদি ফলাহার করা হয়, তাকে 'একভোক্ত ব্রত' বলে, যা কিছু গ্রহণ করা হবে তা ঈশ্বরে উৎসর্গ করে তাঁর প্রসাদ হিসেবে গণ্য হবে।

যাঁরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সঠিক একাদশীর ব্রত পালন করেন, তাদের আর কোনও উপবাসের প্রয়োজন হয় না। কারণ অধিক উপবাস শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। পরিমিত উপবাস শরীরের পক্ষে অতিশয় শুভ। বিজ্ঞানমতে কলিতে নির্জলা উপবাস না করাই ভালো। নির্জলা উপবাসে শরীরের কোষ একেবারে জলশূন্য হয়ে পড়ে, এতে বিভিন্ন রোগব্যাধি আক্রান্ত হয়। উপোস মানে পরিপাক ক্রিয়ার বিশ্রাম। বিজ্ঞান মতে নির্জলা উপবাস করলে অগ্নাশয় থেকে ক্ষরিত রস গলব্লাডারে গেলেই পাথরে পরিণত হয়। প্রতিদিন খাদ্য ও ওষুধ খেয়ে শরীরে বিষ (দুষিত পদার্থ কিংবা টক্সিন) জমলেও তা বের করার একমাত্র সহজ উপায় একাদশীর উপবাস করা। বিজ্ঞানমতে আট থেকে আশি বছর পর্যন্ত এই ব্রত করা যায়। এই ব্রতের আগের ও পরের দিন নিরামিষ খাওয়া উচিত।

এমনকী ওই দুইদিন মুসুর ডাল, কাঁসার পাত্রে খাওয়া, নিমপাতা, পুঁইশাক, বেগুন, লাউ, পান খাওয়া নিষিদ্ধ। উপবাস মাসে দুটির বেশি এবং বারো ঘণ্টার অধিক সময় করা উচিত নয়। মানব হিতৈষীরা বলেছেন— 'চিবিয়ে যে দ্রব্যাদি খাওয়া হয়, এমন খাদ্য ওই নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহণ নিষেধ'। 'স্মৃতি জ্যোতিষ'-এ একাদশীর উপবাসের আসল সময়টি হলে, একাদশীর শেষ অংশ আর দ্বাদশীর প্রথম দিকের বেশি অংশ মূল সময়টি। উপবাসের সময় দুধ, ডাব, ফলের রস, ঘোল ও নুন-লেবু মিশ্রিত জল পান করা উচিত। আর ১৬ অক্ষর ৩২ নাম উচ্চারণ করা। উপবাসের বারো ঘণ্টা পর সায়াহ্নে তেল-মশলা ছাড়া আলু, রাঙালু, পেঁপে ও কাঁচকলা দিয়ে তরকারি খাওয়া উচিত। পরদিন সকালে খালি পেটে তামার পাত্রে রাখা জল ও তিনটি বোঁটা-সহ তুলসীপাতা, শ্বেতচন্দন সেবন করা ভালো। সেবনের মন্ত্রটি হলো অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ। হিন্দু শাস্ত্রমতে একাদশীর উপবাস না করলে, তিনি কোনো ধর্মকর্মে অধিকারী হন না। উপবাস করলে ঈশ্বরলাভ হয় কিনা সে অন্য কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হলো ঈশ্বর আরাধনায় চাই সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন। তাই কম বয়স থেকেই উপবাসের অভ্যাস বাঞ্ছনীয়। □

প্রাচীন বঙ্গদেশের জনগোষ্ঠী

গোপাল চক্রবর্তী

অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সমস্ত স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবগোষ্ঠী বসবাস করত। এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীরা কোন্ কোন্ মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তা সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন। অনুমান করা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে প্রাক্ ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি প্রধানত অস্টিক ও অস্ট্রেলয়েড জাতিসমূহের সৃষ্ট। বর্তমান ঝাড়খণ্ড ও সাঁওতাল পরগনার অধিবাসীরা অতীতযুগের অস্ট্রিক জাতির বংশধর বলে নৃতত্ত্ববিদরা ও ঐতিহাসিকরা মন করেন। আবার চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া অঞ্চলে যে সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি প্রধানত মঙ্গোলয়েড জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চলের বর্তমান উপজাতীয় অধিবাসীরা সুপ্রাচীনকালে বসতি স্থাপনকারী মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীরই উত্তরপুরুষ।

অনুমান করা যেতে পারে যে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর এবং পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল। এই উভয় জাতিগোষ্ঠীই বঙ্গপ্রদেশে বহিরাগত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীরা গোণ্ডোয়ানা ভূখণ্ড থেকে আগমন করে। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীরা ব্রহ্মপুত্র নদের ঊর্ধ্ব অববাহিকা থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পূর্ববঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল ও পার্বত্য সানুদেশে বসতি স্থাপন করে। মধ্যবঙ্গে বড়ো বড়ো নদী সমূহ এবং বিস্তৃর্ণ জলাভূমি উভয় জাতির যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। তৎসত্ত্বেও উভয় জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল না একথা বলা যায় না। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন অস্ট্রিকজাতিগোষ্ঠী দক্ষিণবঙ্গের ভিতর দিয়ে পূর্ববঙ্গ হয়ে প্রাচীন ব্রহ্মদেশ বা বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই হয়ে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।

প্রাচীন গ্রন্থ ও ভাস্কর্য সমূহ থেকে বাঙ্গলার প্রাচীন অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। মহাভারত, ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্, কালিদাসের রঘুবংশম্ প্রভৃতি গ্রন্থে কিরাত নামক এক অনার্য জাতির উল্লেখ দেখা যায়। খ্যাতনামা পণ্ডিত এফ.ই. পার্জিটারের মতে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রামের সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড কিরাতদের বসতি ছিল। 'কিরাডিয়ই' নামক জাতির উল্লেখ প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিকদের বতান্তেও পাওয়া যায়। মহাভারতে কিরাতদের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা আছে।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় রচনাবলী এবং তাম্রশাসন সমূহে হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে কম্বোজ নামক এক দুর্ধর্ষজাতির উল্লেখ দেখা যায়। তারা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে ৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে পাল রাজ্য আক্রমণ করে উত্তরবঙ্গের একটি বিস্তৃত অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। কোটিবর্ষ শাসনকেন্দ্র তাদের হস্তগত হয়। অপর একটি তাম্রশাসনে জানা যায় যে, প্রায় একই সময়ে সমতট রাজ্য এবং এর রাজধানী দেবপর্বত কম্বোজ জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহে শবর নামক এক অনার্য জাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির প্রাচীর গাত্রে পোড়ামাটির ভাস্কর্যে শবর জাতীয় নর-নারীর মূর্তি খোদিত দেখা যায়। চর্যাপদ এবং সমসাময়িক অনেক গ্রন্থে শরব জাতির উল্লেখ আছে।

কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থে নিষাদ নামক এক অরণ্যচারী অনার্যজাতির উল্লেখ আছে। তাদের পেশা ছিল শিকার। অনুমান করা যেতে পারে যে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে এদের আবাসভূমি ছিল। 'তারাতন্ত্র' নামক একটি শাস্ত্রগ্রন্থে পুলিশ নামক এক অনার্য জাতির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ পাঠে মনে হয় শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চলে পুলিন্দ জাতির বসতি ছিল।

প্রাচীন যুগের অনেক তাম্রলিপিতে ম্লেচ্ছ নামক অনার্য জাতির বহুল উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে মূলত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের (কামরূপ, অসম) অধিবাসীদের ম্লেচ্ছ বলা হতো। আবার কয়েকটি তাম্রলিপিতে বাঙ্গলার উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের ম্লেচ্ছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চন্দ্রবংশীয় রাজণ্যবর্গের তাম্রশাসনে লৌহিত্য ও ব্রহ্মপুত্রের পার্বত্য অববাহিকার (গারো পার্বত্য অঞ্চলের সানুদেশ) উপজাতীয় অধিবাসীদের ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কম্বোজ জাতিদের মতো ম্লেচ্ছ জাতিদের মধ্যেও উন্নতসংস্কৃতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তারা যুদ্ধপ্রিয় জাতিতে পরিণত হয় এবং সমতটের বাঙ্গালিদের সঙ্গে সম্প্রসারণের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। মধ্যযুগের প্রথমদিকের ঐতিহাসিকদের বিবরণে যে কোচ, মেচ, থারু ইত্যাদি উপজাতির উল্লেখ দেখা যায় তারা এই ম্লেচ্ছগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনুমিত হয়।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে বাঙ্গালিজাতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর জাতিগত সাদৃশ্য রয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ দ্রাবিড়রা ওড়িশা ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে বাঙ্গলায় প্রবেশ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই স্থানগুলির মধ্যে পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত নামগুলি দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত। অতএব বোঝা যায় এই তাম্রলিপি সমূহ উৎকীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বেই সংশ্লিষ্ট স্থান সমুহ দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত হয়েছিল। দ্রাবিড়রা এক উন্নতমানের সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। বাঙ্গলায় তারা শক্তিশালী প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। তাম্রলিপি ও শিলালিপি সূত্রে জানা যায় যে বঙ্গদেশ দক্ষিণ ভারতীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক বারবার আক্রান্ত হয়েছিল। আক্রমণকারীরা অনেক সময়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে বাঙ্গলায় শাসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করেছে। দক্ষিণ ভারতীয় বংশোদ্ভুত রাজবংশ সমূহের মধ্যে শূর, চেদি, বর্মণ ও সেন রাজবংশ উল্লেখযোগ্য সমগ্র প্রাচীনযুগ ধরে বাঙ্গলায় দক্ষিণ ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ চলেছিল। এর ফলে বাঙ্গলায় দক্ষিণ ভারতীয় ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

অস্টিক, মোঙ্গল ও দ্রাবিড় এই তিনটি প্রধান জনগোষ্ঠীর রক্ত বাঙ্গালি জাতির ধমনিতে বহমান। পরবর্তীকালে উত্তর ভারতীয় জাতি এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে সেমিটিক জাতি বাঙ্গলায় বসতি স্থাপন করেছে। এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠী বাঙ্গালি রক্তে একাকার হয়ে গিয়েছে। □

ত্রিপুরায় বিজেপির ঐতিহাসিক জয়

কুচক্রীদের মুখের মতো জবাব দিয়েছেন ত্রিপুরাবাসী

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

সমস্ত শঙ্কা ও আশঙ্কাকে ছাপিয়ে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে পার্বত্য ত্রিপুরায় অশান্তির নাটের গুরুদের মুখে ঝামা ঘষে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবাদী সরকারের বিজয় পতাকা তার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখলো। ১৯৮০-কে যারা আবার আমাদের সামনে নিয়ে এসে ভ্রাতৃত্ববোধের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিল তাদের সমস্ত কূটচাল গঙ্গার স্রোতে বিসর্জন দিল, ভেস্তে গেল কালো ব্লুপ্রিন্ট। বিচ্ছিন্নবাদীদের যারা উসকানিদাতা তাদের কপালের ভাঁজ বেড়েছে। যারা পেট্রন তাদের সলতে পাকানো চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। এইসব ব্যক্তিদের এখন কপালে হাত, ঝাঁপ ফেলে দিয়ে বাণিজ্যটা গুটিয়ে দেওয়ার পালা।

অনেক সম্ভাবনাময় ত্রিপুরায় আগে—

● বিচ্ছিন্নতাবাদী, ● ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, ● মুষ্টিমেয় কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের নীরব ভূমিকা। ● রাজনৈতিক হিমশীতল হিরণ্ময় নীরবতা। ● জীবনের এবং বিনিয়োগের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা, ● ম্যানিপুলেশন, ● আধিপত্যবাদ, ● দারিদ্র্যের প্রকটতার কারণে ধর্মান্তর, ● বিভাজনকে পোষণ, ● শ্রমিকদের মালিকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে কর্মসংস্কৃতি বিনষ্ট, ● সর্বত্র চাঁদাবাজি, ● নারী অধিকারের নামে নারী নির্যাতন ও যৌন হেনস্থা, ● ট্রেড ইউনিয়নের নামে কর্তাগিরি-সহ অসংখ্য উন্নয়ন বিরোধী কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া, ● একনায়কত্ব, ● ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর ধর্মাবলম্বীদের তোষণ করে সুশাসনের স্বপ্নকে বিলম্বিত করা ছাড়াও গোপনে ভারতের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা ছিল তৎকালীন শাসকশ্রেণীর নিত্যনৈমিত্যিক কর্মসূচি।

কখনো কখনো সম্পদের সুষম বণ্টনের নামে লুণ্ঠনযজ্ঞও ত্রিপুরাবাসী দেখতে বাধ্য হয়েছিল। এক কথায় ত্রিপুরা ছিল সমস্যা ও অরাজকতার স্বর্গরাজ্য। এই সকল মহাসংকটকে সামনে রেখে বিজেপি সামাজিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৮-র নির্বাচনে ত্রিপুরায় পরিবর্তনের যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেখানে জনঅসন্তোষের প্রতিফলন ঘটেছিল। বর্তমানে সকল দাম্ভিকতার প্রাচীর ও অচলায়তন ভেঙে ধুলায় ধূসর হয়ে গেছে।

ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতিধন্য পুণ্যভূমিকে বিভক্ত করার প্রয়াস কুচক্রীদের মজ্জাগত ও বংশপরম্পরা হয়ে উঠেছিল। পাহাড়ে বসবাসরত সহজ সরল মানুষকে ভোটব্যাংক বানিয়ে তাদের পূর্বতন সার্বিক উন্নয়ন বিমুখ করে রেখেছিল শাসকেরা। জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এই জনমানুষকে উপজাতি আখ্যা দিয়ে পরনির্ভরশীল ও অসহায় করে রাখা হয়েছিল। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অনুপস্থিত রেখে কৌশলে দরিদ্রতাকে দীর্ঘজীবী করে রেখেছিল। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাসস্থান-সহ মৌলিক চাহিদা সবসময়ই উপেক্ষিত রাখা হয়েছিল। সীমাহীন বঞ্চনায় বিধ্বস্ত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নীরব কান্না শোনার কেউ ছিল না। নেতাদের সম্পদের প্রাচুর্য আর খেটে খাওয়া মানুষদের নির্যাতন নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছিল। প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করে এক জীবন্ত নরকে রূপান্তর করা হয়েছিল ত্রিপুরাকে। বর্ণনাতীত এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ছিল সময়ের দাবি। বাস্তবেও হলোও তাই। আগ্নেয়গিরির মতো গর্জে উঠলো সবশ্রেণীর মানুষ। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা এবং দাবিয়ে রাখার অপপ্রয়াসেও লিপ্ত হয়েছিল উল্লেখিত কুচক্রীরা। রাষ্ট্রবাদী বিজেপির কাছে তারা

অবশেষে ধরাশায়ী হতে বাধ্য হলো। কিন্তু আবার ষড়যন্ত্রের কৌশল পালটিয়ে ত্রিপুরায় জনবর্জিত নেতাদের নিয়ে দল ভারী করার চেষ্টায় লিপ্ত হলো। গোপনে গোপনে বিষবৃক্ষের বীজ বপনে নিরলস প্রচেষ্টা শুরু করলো তারা। যারা এতদিন একে অপরের প্রতিপক্ষ মনে করতো তারা জোট তৈরি করলো। ঢাকঢোল পিটিয়ে কান ঝালাপালা করলো। অপেক্ষা করতে শুরু করলো পরবর্তী নির্বাচন তথা '২৩-এর সুযোগ নেওয়ার জন্য। সহজ সরল মানুষরা সবই বুঝতে পারলো। জেগে ওঠা মানুষদের ভুল বুঝিয়ে আবার বিপথগামী করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রাখতে আরেকবার বধ্যভূমি মান্দাই, মহারানি চাচুবাজার এবং বোরখার আদলে কোনো অঘটন ঘটানোর চোরাস্রোত বইয়ে দিতে চেষ্টা করলো। ত্রিপুরার সচেতন জনতা সেটি চুরমার করতে ভুল করেনি এবার। সীমাহীন বঞ্চনার কারণে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের জন্য আলাদা আবাসভূমির দাবি তুলতে বাধ্য হয়ে নির্বাচনে গেল। দেশের ভিতরে দেশ আমাদের পবিত্র সংবিধান সমর্থন করে না। অবশেষে নির্বাচনে বিজেপির জয় হলো এবং সুশাসনের পথ সুগম হলো। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সততা এবং ভারতমাতার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি আশীর্বাদ হয়ে উঠল ত্রিপুরার জন্য। সদিচ্ছা থাকার কারণে আলোচনার দুয়ার খুলে বঞ্চিত মানুষদের পাশে রেখে তিনি শান্তির অমোঘ বাণী সঞ্চার করলেন। ক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠী ভরসা ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল পেলেন। বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হলো। ঘনিষ্ঠতা বেড়ে নৈকট্য স্থাপিত হলো। পাহাড় সমতলে শান্তির বাতাস আবার বইতে শুরু করলো। অখণ্ড ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কাজে সকলশ্রেণীর মানুষ সামিল হতে শুরু করলো। লক্ষ্য একটাই, ত্রিপুরার হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা। ভারতবর্ষে শান্তি রক্ষায় এমন নজির আমাদের সম্মানকে আরও উচ্চতা দান করলো।

অস্থিতিশীল রাজনীতি এখন ত্রিপুরায় বর্জ্য, ডাস্টবিনের ময়লা মাত্র। সম্প্রতি সমগ্র জনগোষ্ঠী পরস্পরের হাতে হাত ধরতে শুরু করেছে। লক্ষ্য অভিন্ন, মূলমন্ত্র হলো ভারতের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যারা বিজেপির এই মহতী কর্মযজ্ঞে অংশ নেবে না আপাতদৃষ্টিতে তাদের মানুষ বেইমান হিসেবেই ধরে নেবে। ত্রিপুরায় অভিশপ্ত দিনগুলিতে বেকারত্ব, স্বজনপ্রীতি, কর্মবিরোধী কর্মসংস্কৃতি, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে সমষ্টিগত উন্নয়ন থেকে সরিয়ে সর্বস্তরে দলীয়করণ ও চাঁদাবাজি ছিল অঘোষিত নিয়ম। এই অবস্থা ত্রিপুরায় মানুষের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। এই পাথর নিমেষেই ঐক্যবদ্ধ জনতা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড়ে বসবাসরত বিশাল জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে শুধু রাজনীতির নামে আমাদের সকল সম্ভাবনাকে কালো চাদরে ঢেকে দিয়েছিল। ফলে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে ত্রিপুরার উন্নতি পিছিয়েছে একশো বছর। বিজেপির জন্য এটি আরেকটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ বিজেপির জন্য সহজ হবে যদি তারা টিমওয়ার্ক করে। নিজেদের অন্দরে যৎসামান্য ত্রুটি থাকলেও তাদের জন্য সেটি মোটেও কষ্টের নয়।

বিজেপি ক্ষমতায় দ্বিতীয়বার আসার পরে পাহাড়ে বঞ্চিত মানুষের মনে আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে। তারা ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে নমনীয় হওয়াতে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ তাদের যৌক্তিক দাবিকে যেমন সমর্থন করে তেমনি তাদের মহান ত্যাগকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান করে। এই মহৎ ত্যাগ ত্রিপুরার উন্নতির ভিত্তি রচনা করেছে এবং মাইলফলক হয়ে রয়েছে। ত্রিপুরার সবাই নতুন আশায় বুক বেঁধেছে আবার। এবার আলোকিত ত্রিপুরা সারা ভারতে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ।

হৃত ভ্রাতৃত্ববোধ পুনরুদ্ধারে বিজেপির সময়োচিত পদক্ষেপের মহাকর্মযজ্ঞ এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। পরিশীলিত জনমুখী রাজনীতি এবং স্বচ্ছতা আনাই আমাদের কাম্য। এরই মধ্যে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে শুরু করেছি। আর নয়, চলুন সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সবার জন্য শ্রেষ্ঠ বাসযোগ্য ত্রিপুরা গড়ে তুলি। ভুলে যাই অতীতের সমস্ত গ্লানি। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াই। □

পাকিস্তানে বিপর্যয়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

পাকিস্তানের অর্থনীতি বছরের পর বছর ধরে নিম্নমুখী। চড়া মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব ও বিশাল সরকারি ঋণ-সহ পাকিস্তান বর্তমানে গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদে সমর্থন বিষয়টাকে আরও ঘোরালো করেছে, দেশটা বিদেশি বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার হারিয়েছে।

পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতা পর্যুদস্ত : কয়েকদিন আগে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার আধিকারিক আইএসআইয়ের গুপ্তচর মোস্তফা কামাল বারকি ইসলামিক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন। এটা কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ পাকিস্তান নিজেই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর আর এখন নিজের দ্বারাই আক্রান্ত। ৪-৫ বছর ধরে অবিরাম পাকিস্তান ভালো সন্ত্রাসবাদ এবং খারাপ সন্ত্রাসবাদের এই দুই ধারণা পোষণ করে চলেছে। এবং তথাকথিত খারাপ সন্ত্রাস এই মুহূর্তে পাকিস্তানকে আঘাত হেনেছে। তেহরিক-ই- তালিবান এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দাবি করেছে।

তেহরিক-ই-তালেবানের তাবিজ : একটা ইসলামি ধর্মান্ধ দেশ তার নিজের দেশের জঙ্গির হাতে মারাত্মক ভাবে আঘাত পাচ্ছে এটা ভাগ্যের পরিহাস। স্পষ্টত পাকিস্তান ভারতের উপর সন্ত্রাসবাদ চাপানোর সবচেয়ে বড়ো কাঁটা এবং অন্যান্য বড়ো সন্ত্রাসীদের জন্য আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখন প্রাণঘাতী তেহরিক-ই-তালিবান দ্বারা আক্রান্ত, এটা কিন্তু আফগানিস্তানের তালিবান থেকে পৃথক একটি দল। এবং টিইটিপির মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তানে শরিয়া আইন জারি করা।

টিইটিপির তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের নিষ্ক্রিয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি জেগে উঠছে আর তারা পাকিস্তানেরই বিরুদ্ধে কাজ করছে। ইসলামিক স্টেট (আইএস), আল-শাবাব, বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এবং জামাত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) সবচেয়ে মারাত্মক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। ইন্ডিয়ান ডিফেন্স রিভিউয়ের রিপোর্ট অনুসারে ২০২২ সালে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়। এবং এর সঙ্গে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি সন্ত্রাসী হামলায় বিস্ময়কর টিইটিপিকে ছাড়িয়ে গেছে।

ইসলামিক স্টেট, খোরাসান প্রদেশ (আইএসকে) আফগানিস্তান সীমান্তে কেন্দ্র-শাসিত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ১৩টা হামলার ছক কষে তা কার্যকর করেছে, তারপরে খাইবার-পাখতুনখোয়ায় আটটা ও বালুচিস্তানে দুটো হামলা করেছে। পাকিস্তানে আইএসকে-এর সবচেয়ে মারাত্মক হামলার ঘটনা ঘটেছে খাইবার-পাখতুনখোয়ায় যখন জুমার নামাজের সময় একটা শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর হামলায় কমপক্ষে ৫৬ জন নিহত হয়।

আইএমএফ পাকিস্তানের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে : এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যাতে দেশ চালাতে পারে তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড সংক্ষেপে আইএমএফ)-এর দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আইএমএফ তো কোনো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নয় যে অত সহজে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। আর তাই আইএমএফ পাকিস্তানকে তার বাস্তব পরিস্থিতি দেখে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (আইএমএফ) পাকিস্তানকে অনিশ্চিত আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা ব্যয় কমাতে বলেছে। যেহেতু পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেট বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং কোনো বড়োসড়ো কাটছাঁট দেশটার সামরিক ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আস্থা হারাচ্ছে, সরকার নাগরিকদের সমর্থন ও আস্থা হারিয়েছে। তবে পাকিস্তানের দুর্বল রাজনৈতিক দৃশ্যপট সবসময়ই পাকিস্তানের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন যে সামরিক বাহিনী দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে তারা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। দুই দশক ধরে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে নাকাল ও ব্যতিব্যস্ত করতে উদ্যত সামরিক বাহিনী এখন নিজের জালে জড়িয়ে নিজের সঙ্গে গোটা দেশের পতন ঘনিয়ে তুলেছে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে সন্ত্রাস পরিস্থিতি এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ পাকিস্তানের পতনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে।

এসসিও-তে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান : সাম্প্রতিক ক্রমান্বয়ে পাকিস্তান সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সভায় যোগদানের বিষয়ে সম্মত হয়েছে। গত ২৯ মার্চ নয়াদিল্লিতে এনএসএ (জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা) স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত সব সদস্য দেশকে আমন্ত্রণ জানালেও পাকিস্তান এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়নি। তবে পাকিস্তানের সুর যে নরম হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এসসিওতে পাকিস্তান আর্থিক সাহায্য চাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

পাকিস্তানের এই বিপর্যয় তার মূলোৎপাটিত নেতৃত্ব বিশেষ করে প্রক্সি নেতৃত্বের দিকে আঙুলি নির্দেশ করে। জাতীয় নেতৃত্বের নামে প্রক্সি সামরিক বাহিনী দেশকে লুটপাট করছে দায়িত্বহীনভাবে। যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সামরিক নেতৃত্বের হাতের পুতুল, তা একুশ শতকে মানুষকে আশা জাগিয়েছিল। পরিস্থিতি কার্যত ভারতের জন্যও উদ্বেগজনক, কারণ এই অঞ্চলে অশান্তি সমগ্র আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর উন্নতির পক্ষে ভালো নয়। ভারত বর্তমানে যে কোনো ধরনের আসন্ন আকস্মিকতার মোকাবিলায় জন্য নিজেকে শক্তিশালী করার পথে এগিয়ে রয়েছে। অথচ, পাকিস্তানে আসন্ন বিপর্যয়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে! □

অন্যের বাসায় চুরি করে নিজের ঘর তৈরি করে চশমাচোখো চড়ুই

বিশেষ প্রতিনিধি॥ দূর থেকে দেখে মনে হয় চশমা চোখে উড়ে বেড়াচ্ছে হলুদ রঙা চড়ুই। কাছে এলে নজরে পড়ে হলুদ পালকে ঢাকা চড়ুইয়ের দুই চোখের চারপাশে ঘিরে আছে একগুচ্ছ সাদা লোম। যা হঠাৎ দেখলে ঠাহর হয় পাখিটি বুঝি চোখে চশমা এঁটেছে। হোয়াইট আই পরিবারের অন্তর্গত চড়ুইজাতীয় এই পাখির বিচরণক্ষেত্র মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। যেকারণে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ওরিয়েন্টাল হোয়াইট আই'। তবে ইদানীং ভারতজুড়ে এদের আনাগোনা বাড়ার দরুন এদের 'ইন্ডিয়ান হোয়াইট আই' নামেও ডাকা হয়। আর আমরা গোদা বাংলায় বলি 'চশমা চোখো পাখি'।

ভারতীয় উপমহাদেশের উন্মুক্ত বনাঞ্চলে ঝাঁকে ঝাঁকে এই পাখির দেখা পাওয়া যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় ও গাছে এবং বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ অরণ্যে বাসা বাঁধতে এরা বিশেষ পছন্দ করে। আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে হামেশাই এদের দেখা মেলে। শুধুমাত্র ডিম পাড়ার সময়ে এবং পরবর্তীকালে শাবক লালনপালনের জন্যই এই বাসার ব্যবহার করে থাকে চশমা পাখিরা। নাহলে জীবনের বেশিরভাগ সময় হয় আকাশে উড়তে উড়তে নয়তো ভাসমান অবস্থাতেই কেটে যায় তাদের। মাটিতে তাদের নামতে দেখা যায় না বললেই চলে।

সবচেয়ে প্রথমে ১৮২৪ সালে ডাচ প্রাণীবিদ্যাবিশারদ কোয়েনরাড জেকব টেমিংক সুন্দরবন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি চশমা চোখো চড়ুইকে পর্যবেক্ষণ করেন। কোয়েনরাড পাখিটির নাম রাখেন সিলভিয়া প্যালপেব্রোসা। হোয়াইট আই প্রজাতির অন্তর্গত চড়ুই জাতীয় এই পাখির দেহের উপরের অংশটা হলদে ঘেঁষা জলপাই রঙের। পেটের রং ময়লাটে সাদা। যদিও প্রজাতি ভেদে এদের তারতম্য দেখা যায়। দৈর্ঘ্যে ৮-৯ সেন্টিমিটার। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম জসটেরোপ্স প্যালপেব্রোসা। চোখের প্রাকৃতিক চশমাটির জন্য ভীষণভাবে আকর্ষণীয় দেখতে লাগে এদের। পাখি বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে চশমা পাখিদের ১১টি অন্তঃপ্রজাতির খোঁজ পেয়েছেন। নানারকমের ফুলের মধু, শাঁসযুক্ত রসালো ফল এবং ছোট পোকামাকড় হলো এদের প্রতিদিনের খাবার।

অন্য পাখিদের বাসা তৈরির সামগ্রি চুরি করতে একেবারে সিদ্ধহস্ত চশমা পাখিরা। অন্য পাখির তৈরি করা বাসায় হানা দিয়ে তাদের খড়কুঠো ঠোঁটে করে তুলে এনে, তা দিয়ে নিজেদের বাসা বানায় এরা। বাসাগুলি দেখতে হয় আঁটসাঁট বাটির মতো। এই বাসা বানাতে চশমাচোখোদের সময় লাগে মাত্র দু'দিন। অবশ্য একটি বেজায় ভালো গুণও আছে চশমা পাখিদের। এরা অন্য পাখির শাবকদের চেঁচামেচি করতে দেখলে ঠোঁটে করে খাবার এনে তাদের খাওয়ায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার গোত্রের পাখির শাবকদের খাওয়াতে এরা পছন্দ করে। সেইসব শাবকদের মা-পাখিরা এতে এতটুকুও রাগ করে না। কারণ তারা চশমা পাখিদের এধরনের গুণের সঙ্গে বেশ পরিচিত। এমন ঘটনা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'ইন্টারস্পেসিফিক ফিডিং' নামে পরিচিত।

চশমা পাখিরা সবসময় দলবদ্ধভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়তে পছন্দ করে। একমাত্র প্রজননের সময়ই এরা দলছুট হয়। ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস এদের প্রজননকাল। তবে এপ্রিল মাসটাই প্রজননের জন্য এদের কাছে আদর্শ সময়। দুটি ফ্যাকাশে নীল রঙের ডিম পাড়ে এরা, যা থেকে বাচ্চা ফুটে বের হতে সময় লাগে মাত্র দশদিন। যতদিন পর্যন্ত শাবকরা উড়তে না পারে ততদিন যত্নের সঙ্গে লালনপালন করে চশমা পাখিরা। পশ্চিমবঙ্গে এরা অবশ্য আরও দুটি নামে পরিচিত। শ্বেতাক্ষী ও বাবুনাই। বলা হয় আজকের বিশ্বে সবচেয়ে বিপদমুক্ত পাখি এরাই। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে।

তথ্যসূত্র : *বনবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার*

ঘনক রহস্য

অধীর ও আনন্দ শৈশব থেকে এক স্কুলেই পড়ে। ওদের প্রথম দেখা বিশুবাবুর টোলে। তাই বন্ধুত্বও গভীর। দুজনেরই জানার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। এক রবিবার দুপুরে তাদের মধ্যে কথা

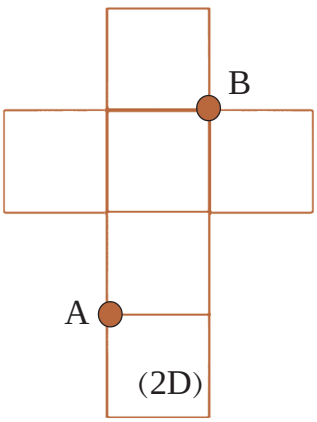

হচ্ছিল আগের দিনের ক্লাসে যে অঙ্ক শিখেছে সেই বিষয় নিয়ে।

দুই বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব হলো একটি সরলরেখা। হুঁ! এটা তো সবাই জানে। এতে আবার শেখার কী আছে?— বলল অধীর। আনন্দ বলল, তা ঠিক।

আনন্দ আবার বলল, চল, অমেয় জ্যাঠার কাছে যাবি? তাঁর সঙ্গে অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করতে বেশ লাগে। অধীর তাতে সায় দিল। বলল চল, এবিষয়ে তাঁর কী মত শুনেই আসি।

অমেয় জ্যাঠা এক পাড়াতেই থাকেন। একসময় শিক্ষকতা করেছেন। এখন বাড়িতেই থাকেন। অধীর আর আনন্দের অঙ্ক আলোচনার সঙ্গী। জ্যাঠার বাড়িতে অধীর আর আনন্দ যখন এল, তখন তিনি একটি বই পড়ছিলেন। দুজনকে দেখে বইটা রেখে দিয়ে তাদের খাতির করে বসালেন। তারপর বললেন, বলো, আজ কী ভেবে মানিকজোড়ের আসা হলো?

অধীর আর আনন্দ বেশ গুছিয়ে তাদের আসার কারণ বলল। জ্যাঠা একটু ভেবে বললেন, তোমাদের একটি প্রশ্ন দিচ্ছি। তাতে তোমাদের কাছে

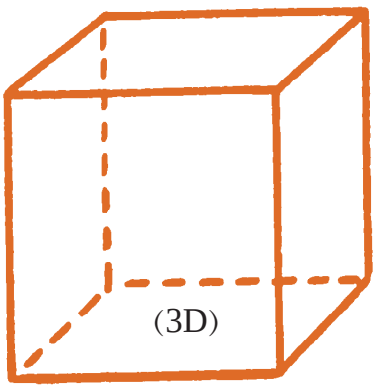

ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ধরো, একটা পিঁপড়ে ১ মিটার দৈর্ঘ্যযুক্ত প্রান্তবিশিষ্ট একটি ঘনকের শীর্ষবিন্দু থেকে শুরু করে কর্ণ বরাবর ঠিক উলটো দিকের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য সংক্ষিপ্ততম পথের দৈর্ঘ্য কত হবে? একটু হেসে বললেন, এখানে পিঁপড়েটাকে ছেড়ে শুধু অঙ্কটি নিয়ে ভাবো এবং মাথায় রাখো যে ঘনকের মধ্যে গর্ত করে যাওয়া যাবে না।

দুজনেই কয়েক মিনিট ভাবার পর আনন্দ নীরবতা ভেঙে বলে ওঠে, 'সংক্ষিপ্ততম পথ কি প্রান্ত বরাবর চললে হবে?' অধীর বলল, না, আমার মনে হয় পিঁপড়েটি যে প্রান্তের শীর্ষবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে যেকোনো একটি তল বরাবর কর্ণ ধরে গেলে সেই তলের উলটো দিকের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যাবে, যার দৈর্ঘ্য হবে $\sqrt{২}$ এবং তারপর সেই শীর্ষবিন্দু থেকে সামনের প্রান্ত বরাবর হাঁটলেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। তাহলে মোট পথের দৈর্ঘ্য হলো— $\sqrt{২}$ +১ মিটার।

জ্যাঠা হেসে বললেন, সঠিক উত্তর, $\sqrt{৫}$ মিটার। কী করে বলতে পারো?। দুজনেই বলল, না।

জ্যাঠা গলাটা খানিক পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, এই ঘনকটিকে ত্রিমাত্রিক (3D) ঘনক ভেবে নিলে মুশকিল। একটু বুঝিয়ে বলি— ধরো, ঘনকটি একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স। তুমি প্রথমে যে শীর্ষবিন্দুতে ছিলে তার নাম দাও A এবং যেখানে (যে শীর্ষবিন্দুতে) যাবে তার নাম দাও B।

আশাকরি তোমরা বুঝতে পারছ যে কার্ডবোর্ডটি সহজেই খোলা যায়। খুললে এমনটা দেখাবে (ছবি)। AB-র মধ্যে সংক্ষিপ্ততম পথ হলো একটি সরলরেখা। এবার খোলা বাক্সটাকে ভাঁজ করে ঘনক তৈরি করলেই দেখবে সংক্ষিপ্ততম পথ (A থেকে B-তে পৌঁছানোর জন্য)। পিথাগোরাসের থিয়োরেম দিয়ে দেখতে পারো পথের দৈর্ঘ্য $\sqrt{৫}$ মিটার।

কী হে মানিকজোড়, কী বুঝলে? তারপর নিজেই নিজের গোঁফের তলায় ওক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বললেন, অঙ্কে এমন অনেক বিষয় আছে যা চোখের দেখায় অতীব সাধারণ মনে হয়; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রয়োগ করলেই অসাধারণত্ব লাভ করে।

মৌনব দাস,
দ্বাদশ শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল,
কলকাতা।

বীর বনবাসী

সিনগী দঈ

চতুর্দশ শতাব্দীর উরাওঁ বীরাঙ্গনা সিনগী দঈ। বিহারের রোহতাসগড়ের উরাওঁ রাজা রুইদাসের কন্যা ছিলেন তিনি। তিনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। অস্ত্র ও অশ্বচালনায় পটু ছিলেন। বড়ো হয়ে বাবাকে রাজকার্যে সহায়তা করতেন। মুঘলদের রোহতাসগড় রাজ্যের ওপর খুব লোভ ছিল। সরহুল উৎসবের দিনে উরাওঁ পুরুষরা উৎসবের আনন্দে মেতে থাকার সময় মুঘলরা রোহতাসগড় আক্রমণ করলে সিনগী দঈয়ের নেতৃত্বে উরাওঁ মাহিলারা পুরুষবেশে সজ্জিত হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনবার তাঁরা মুঘল সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন। বীরাঙ্গনা সিনগী দঈয়ের স্মরণে আজও উরাওঁ সমাজ 'মুক্কা সেন্দরা'-র আয়োজন করে থাকে।

জানো কি?

- গণিতের সর্বোচ্চ পুরস্কার হলো 'দ্য ফ্লিডস মেডেল'।
- গণিত একমাত্র বিষয় যাতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় না।
- গণিতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হলো সুডুকু
- ৬ হলো সবচেয়ে ছোটো পারফেক্ট নাম্বার।
- ৬-এর বিভাজকদের (৬ ছাড়া) যোগ করলে ৬ হয়।
- ০.৯৯৯৯৯৯৯=১।
- ২৫২০ হলো সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যেটি ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ও ১০ দ্বারা বিভাজ্য।

ভালো কথা

হনুমান

এবার রামনবমীর শোভাযাত্রায় আমি হনুমান সেজেছিলাম। আরও অনেকে সেজেছিল। কেউ কেউ রাম-সীতা সেজেছিল। বিশাল শোভাযাত্রা হয়েছিল। রাম-সীতা ঘোড়ার গাড়িতে বসে ছিল কিন্তু আমরা হনুমানরা গদা নিয়ে 'জয়শ্রীরাম' বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছিলাম। রাস্তার দুপাশে মায়েরা আমাদের লাড্ডু ও জল খাইয়েছে। দুঘণ্টা হেঁটে আমার পায়ে ব্যথা ধরে গিয়েছিল। দাদারা আমাদের ছবি তুলে রেখেছে।

দীপ জানা, সপ্তম শ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) দা ত কি	(১) চি চি মি কি র র
(২) উ ত না	(২) র র টা টু পু পু

৩ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) প্রাণবায়ু (২) ফুলকপি

৩ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) সর্বপাপনাশক (২) হরিসংকীর্তন

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, ই. বি, মালদা। (২) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪ (৩) অনিক মণ্ডল, খড়িয়প, আমতা, হাওড়া (৪) শোভা মহান্তি, মানবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

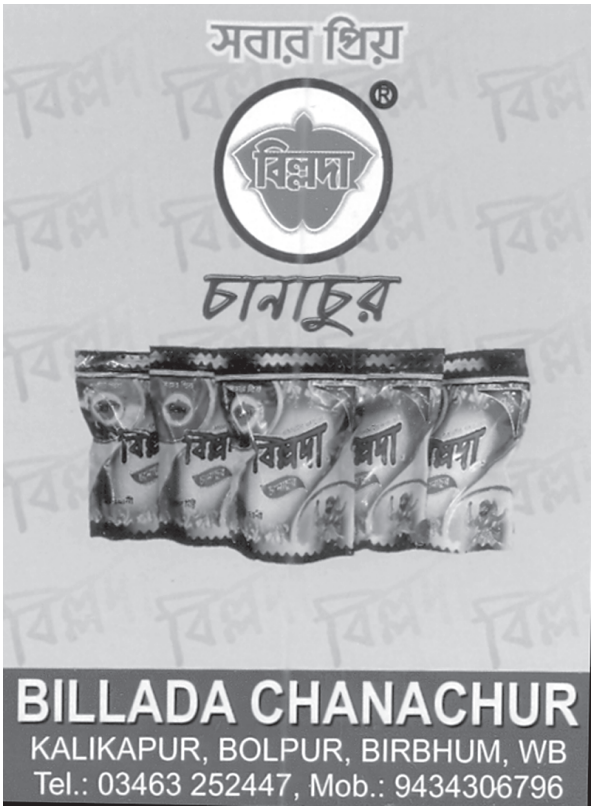

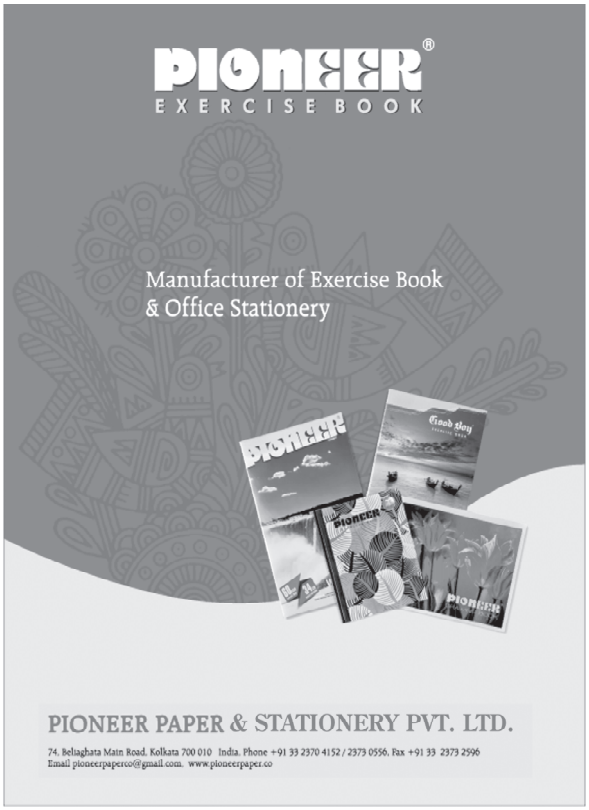

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায়

সনাতন বিদ্যার্থী

ভারতবর্ষের মাটিতে প্রায় এক সহস্রাব্দব্যাপী ইসলামিক শাসনের যবনিকা পতন ঘটে অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে, যার প্রধানতম শক্তি ছিল ব্রিটিশরা। ভারতের ইতিহাস রচয়িতারা একে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করলেও ভারতবাসী প্রকৃতপক্ষে বাঘের মুখ থেকে গিয়ে পড়েন কুমিরের মুখে। একথা সত্য যে ইসলামি শাসনকালে দেশজুড়ে ব্যাপক গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারীর ওপর অত্যাচার এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ঘটেছিল। এত বড়ো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এক বিরাট অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিলেন। সংখ্যাটা কারও মতে ৮ কোটি, আবার কারও মতে ৪০ কোটি। এর ফলে ভারতের জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ছিল শোষণের আরেক নতুন অধ্যায়, যার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ভারতবাসী কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অবধি জোটবদ্ধ হতে শুরু করেন। সে আরেক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। কেমন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকা? অনেকেই মন্তব্য করেন ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁরাও নাকি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন সমানভাবে। আবার অনেকে একথা মানতে চান না। কিন্তু প্রকৃত তথ্য কী বলে?

ইংরেজরা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর এদেশের ভিতরে ও বাইরে ইসলামের দখলদারি দারুণভাবে কমে আসে। হঠে যায় উত্তর পশ্চিমের বর্বর হানাদারেরা। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে স্থায়ীভাবে রয়ে যায় ইসলাম মজহবটি এবং তাকে ব্যবহার করে গড়ে ওঠা কট্টরবাদ। যা ব্রিটিশ আমলেও বিশেষ পালটায়নি। ফলে ভারতেরই মাটিতে সৃষ্ট মুসলমান সম্প্রদায়, যাঁরা আসলে প্রায় সকলেই ছিলেন সেই দীর্ঘ বিদেশি শাসনকালে ধর্মান্তরিত। ধর্মীয় কারণেই তাঁদের বেশিরভাগের অবচেতনে উপ্ত থেকে যায় ধর্মীয় কট্টরবাদের বীজ। এই প্রসঙ্গে ড. আম্বেদকর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পাকিস্তান অর দ্য পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' বইয়ে লিখেছিলেন, 'In time, they (the Islamic invaders) also receded from their farthest limits; while they lasted, they left a deep deposit of Islamic culture over the original Aryan culture in this north-west corner of India which has given it a totally different colour, both in religious and political outlook'। ফলে যে দেশের মাটিতে স্মরণাতীতকাল থেকে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে এসেছেন, আকস্মিক ধর্ম পরিবর্তনের পর থেকে সেই ভারতবর্ষকেই আর নিজের

ফঃ ৬

মাতৃভূমি বলে নেওয়া মুসলমানদের একটা বড়ো অংশের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। একই রকম অসম্ভব হয়ে ওঠে অমুসলমানদের নিজেদের সম্মান মর্যাদা ও অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তাদের মেনে নেওয়া। ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠা তো দূরের কথা। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইসলাম অনুযায়ী পৃথিবীর সব মুসলমানদের একমাত্র আনুগত্য থাকা উচিত ইসলামের প্রতি এবং তার অনুসারীদের প্রতি।

একদিকে ধর্মীয় কট্টরবাদী মনোভাব, অপরদিকে ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি— এই দুইয়ের যুগপৎ প্রভাবে বলীয়ান হয়ে ভারতের মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ এদেশে থেকেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টায় পৃথক ভাষা, পৃথক শিক্ষা-সংস্কৃতি, পৃথক আইন ও আইনসভা, এমনকী পৃথক দেশেরও দাবি করতে থাকেন। ১৮৯৯ সালে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ এবং কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সদস্য থিওডর মরিসনের এ বিষয়ে অভিমত ছিল, 'The views held by the Mahomedans (certainly the most aggressive and truculent of the peoples of India) are alone sufficient to prevent the establishment of an independent Indian Government.' এবং ইংরেজ আমলে এই দৃষ্টিভঙ্গি এতখানি কট্টর হয়ে উঠেছিল যে ১৯০৮ সালে মুসলিম লিগের তরফে স্যার সইদ আলি ইমাম বন্দে মাতরম্ গান ও রাখিবন্ধনের মতো উৎসবের বিরুদ্ধেও 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার' অভিযোগ তুলেছিলেন। মুসলমান অধ্যুষিত ঢাকাতে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম প্রসিদ্ধ সংগঠন অনুশীলন সমিতির পাঁচশোর বেশি শাখা এবং পনেরো থেকে কুড়ি হাজার সদস্য থাকলেও কোনো মুসলমান সদস্য ছিলেন না।

ভারতের সুদীর্ঘ ইসলামিক শাসনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের জনবিন্যাসে নিরন্তর পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে একটি স্থায়ী আকার দেওয়া, যা ইসলাম পরবর্তী যুগেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ও পঞ্জাবে। ১৯৩১ সালে পঞ্জাবে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৫৩ শতাংশ। হিন্দু ও শিখদের মোট সংখ্যা ৪৬ শতাংশ। এর মধ্যে শিখরা ১৩ শতাংশ। অর্থাৎ হিন্দু ৩৩ শতাংশ। ওই ১৯৩১ সালে অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশে মুসলমান ছিলেন ৫৫ শতাংশ। হিন্দু ৪৩ শতাংশ। আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণকারী দুটো প্রদেশও ছিল বঙ্গপ্রদেশ ও পঞ্জাব। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রাণবলিদানের তালিকায় মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা তুলনায় নগণ্য। এ প্রসঙ্গে ২০১৯ সালের ৭ মার্চ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকাল রিসার্চ এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত 'ডিকশনারি অব মার্টায়া অব ইন্ডিয়া'জ ফ্রিডম স্ট্রাগল (১৮৫৭-১৯৪৭)'-এ প্রকাশিত সারা ভারতের প্রাণবলিদানকারির নামসংবলিত তালিকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই অভিধানে মহাবিদ্রোহ, জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা, গদর আন্দোলন, লাহোর ও দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা, আজাদ হিন্দ বাহিনী ও অনুশীলন সমিতির কীর্তি, আলিপুর বোমা মামলা, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ প্রভৃতি প্রায় সবকটি উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতার লড়াইয়ের সঙ্গে জড়িত থেকে প্রাণ বলিদান দেওয়া সাড়ে পনেরো হাজারের অধিক ভারতীয়র নাম ও পরিচিতি রয়েছে।

ভারতে প্রথম বৃহদাকারে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ যাতে বহু মুসলমানও যুক্ত ছিলেন। এই সংগ্রামকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই ভারতবর্ষ স্বাধীন করার পক্ষে সওয়াল করে বিলেতের মাটিতে একটি বই প্রকাশিত হয় মারাঠি ভাষায়, যা পরে ইংরেজিতে অনূদিত হয় 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স অব ১৮৫৭' নামে। মারাঠি গ্রন্থটি ব্রিটিশ ভারতে প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। লেখক বিনায়ক দামোদর সাভারকর, সেই ব্যক্তি যিনি পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু জাতীয়তাবোধের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার চেতনা ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অপরদিকে সেই একই লড়াইয়ে মুসলমানদের অংশগ্রহণের পিছনে তাঁদের নেতৃত্বের পরিকল্পনা নিয়ে ড. আম্বেদকরের পর্যবেক্ষণ ছিল, 'The Mutiny was an attempt by the Muslims to reconvert India into a Dar-ul-Islam.' (ইসলামিক শাসনাধীন ভূখণ্ড)।

ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার ১৯৩০ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বাঙ্গালি সাহিত্যিক স্যার নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'মার্শ্যাল রেসেজ অব ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে তথ্যসহযোগে দেখিয়েছিলেন মহাবিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে হিন্দু- মুসলমানদের জাতিগত অনুপাতকে (১৯৪১ সালে ছিল ৬৭ : ১) সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ সরকার কীভাবে সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের অনুপাত রাতারাতি বাড়িয়ে দেয় (২৫ : ১১)। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পদানত করার সুযোগ দিয়ে আসলে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের শক্তি খর্ব করা হয়। আম্বেদকরের মতে, এ উদ্দেশ্য এত সহজে সফল হওয়ার কারণ মুসলমানদের চোখে হিন্দুদের কাফের হিসেবে দেখানো, যার ফলে মুসলমানদের অধিকাংশ মনে করতেন তাঁদের ধ্বংস করাই ইসলামের বিধান।

এরপর ভারতের মাটিতে মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম হিন্দু বিরোধী আন্দোলন ছিল খিলাফত আন্দোলন যা ভারতীয় মুসলমান আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) নামেও পরিচিত। তুরস্কে ইসলামি খলিফাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানরা শওকত আলি জওহর ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে পরিচালিত

একটি প্যান ইসলামিক রাজনৈতিক প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেন। তারা সুন্নি মুসলমানদের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বিবেচিত হন। এই আন্দোলন ছিল সার্ব চুক্তির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে খলিফা এবং অটোমান সাম্রাজ্যের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অর্থাৎ খিলাফতের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার আদৌ কোনো সম্পর্কই ছিল না। ১৯২২ সালের শেষদিকে খোদ তুরস্ক আরও অনুকূল কূটনৈতিক অবস্থান অর্জন করে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে অগ্রসর হলে এই আন্দোলন ভেঙে যায়। ১৯২৩ সালে তুর্কি নেতা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে স্বাধীনতার দীর্ঘ যুদ্ধের পর ইসলামিক অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশটি এক প্রজাতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৪ সালের মধ্যে তুরস্ক খলিফার পদটি বাতিল করে দেয়। স্বাধীন তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেন্ট আতাতুর্কের বক্তব্য ছিল, 'Even before accepting the religion of the Arabs (Islam), the Turks were a great nation. After Accepting the religion of the Arabs, this religion, didn't effect to combine the Arabs, the Persians and Egyptians with the Turks to constitute a nation ...(This religion) rather, loosened the national nesous of Turkish nation, got national excitement numb.'

ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রশ্নে অবশিষ্ট ভারতীয়দের থেকে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল। প্রথম পক্ষের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শাসনের হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন ও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গঠন। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের লক্ষ্য ছিল ভারত নামক ভূখণ্ডে ইসলামিক শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ক্রমশ বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার সংযুক্তীকরণ। ১৯২৪ সালে টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সাক্ষাৎকার (থ্রু দ্য ইন্ডিয়ান আইজ অন দ্য পোস্ট খিলাফত হিন্দু-মুসলমান রায়ট, টাইমস অব ইন্ডিয়া ১৮.০৪.১৯২৪) থেকে জানা যায়, তিনি মুসলমানদের খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোনো ইসলামিক বহিঃশক্তি ভারত আক্রমণ করলে মুসলমানরা উভয় সম্প্রদায়েরই এই মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের হিন্দু প্রতিবেশীদের পাশে দাঁড়াবেন কিনা? উত্তরে খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মহম্মদ আলি বলেছিলেন, কোনো অবস্থাতেই একজন মুসলমানের আরেকজন মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো (ইসলামে) অনুমোদনযোগ্য নয়।

দুর্ভাগ্যজনকভবে প্রকৃত সমস্যার গোড়ায় পৌঁছানোর পরিবর্তে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল যেনতেন প্রকারে দুই সম্প্রদায়ের বাহ্যিক ঐক্যের এক কৃত্রিম ছবি তুলে ধরা এবং বকলমে সেই কট্টরবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া। যার প্রধান স্থপতি ছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু কট্টরবাদী শক্তির সঙ্গে আপোশ করার মরিয়া চেষ্টায় অকাতরে হিন্দু স্বার্থ ও হিন্দু জীবন বলিদান দিয়েও ধর্মান্ধ মানুষগুলির মনোভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় (থ্রু ইন্ডিয়ান আইজ, ২১.০৩.১৯২৪) জাতীয় কংগ্রেসের ৩৪তম সভাপতি এবং মুসলিম লিগের চতুর্দশ সভাপতি মহম্মদ আলি জওহরের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ— 'Yes, according to my religion and creed I do hold an adulterous and fallen Musalman to be better than Mr. Gandhi.' কারণ শত হলেও গান্ধীজী ছিলেন কাফের।

অথচ খিলাফত আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন আখ্যা দিয়ে গান্ধীজী লেখেন, 'I would gladly ask for postponement of Swaraj activity if thereby we could advance the interest of the Khilafat.' যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহরু প্রমুখের উদ্যোগে দেশজুড়ে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হচ্ছিল, মুসলমানরা গান্ধীজীর প্রশ্রয়ে সেইসব কাপড় তাঁদের তুর্কি ভাইদের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেয়। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতা নয়, মুসলমান নেতৃত্বের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মাটিতে পৃথক মুসলমান রাজত্ব কায়েম করা। মুসলমানদেব প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম লিগ এই সকল দাবি সামনে রেখেই ব্রিটিশ ও অবশিষ্ট ভারতবাসীর সঙ্গে দর কষাকষি চালিয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি।

বস্তুত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে মুসলমানরা ভারতবর্ষকে দেখতেই চায়নি। ড. আম্বেদকর এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'The Muslims have openly declared that they do not want to have any Central Government in India and they have given their reasons in the most unambiguous terms'। যিনি প্রথম ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে একটি আলাদা দেশ গঠনের প্রস্তাব দেন তাঁর নাম মহম্মদ ইকবাল। সেই ইকবাল যাঁর রচিত উর্দু গান 'সারে জাহাঁ সে অচ্ছা' একসময়ে 'তরান-এ-হিন্দ' বা হিন্দুস্থানের গণসংগীত হিসেবে ব্যবহার করত অখণ্ড ভারতবর্ষ। খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ইকবাল ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌয়ে বার্ষিক অধিবেশনে মুসলিম লিগের সভাপতি হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে মুসলিম লিগের বরিষ্ঠ পদাধিকারী ইকবাল ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে একটি পৃথক ইসলামি দেশ গঠনের রূপরেখা পেশ করেন। এরপর লন্ডনে আয়োজিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক (১৭ নভেম্বর— ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩২) চলাকালীন ইকবাল বৈঠকের সদস্যদের মধ্যে প্রস্তাবটি প্রকাশ করেন। তবে ঘরোয়াভাবে সদস্যদের মধ্যে এটি বণ্টন করা হলেও তা হিন্দু ভারতীয় বা ব্রিটিশ কোনো পক্ষেরই অনুমোদন পায়নি। কিন্তু স্যার রহমত

আলি নামক অপর এক বিলেত ফেরত আইনজীবীর অভূতপূর্ব তৎপরতায় এই বিষয়টি ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়।

ইকবালপ্রণীত সূত্র ধরে অগ্রসর হয়ে রহমত আলি ১৯৩৩ সালে পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা করেন। হ্যালিডে এডিব নাম্নী এক তুর্কি লেখিকা ও চিন্তাবিদ এই রহমত আলির একটি সাক্ষাৎকারের কথা তাঁর বই 'ইনসাইড ইন্ডিয়া' (১৯৩৭)-তে উল্লেখ করেছেন। সেখানে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তান গঠনের ভাবনা ও তার এমন নামকরণের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে রহমত আলি মন্তব্য করেছেন, 'First the Muslems had their homelands in Pakistan; that is, Punjab, North-West Frontier Province (also called Afghan Province), Kashmir, Sind and Baluchistan. The name Pakistan I derived from the names of these five Provinces... The area is separated from India proper (Hindustan) by the Jumna; and it is not a part of India, Although twelve hundred years ago there were Hindus and a Hindu Empire since 712, for over a thousand years, they (the Hindus) have been a minority community there...Hindustan was the Muslem Empire, where for over nine hundred years they ruled over a vast native majority...as distinct from Pakistan, the Muslems who settled in these Muslem Imperial Dominions of Hindustan became a minority community in Hindustan...Our scheme is a plan for an independent and separate Pakistan composed of the five Muslem Provinces in the North and possessing equality of status with Hindustan...

লক্ষণীয় এখানে ভারতবর্ষকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে মুসলমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি উপনিবেশ হিসেবে। এবং এই সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও স্বাধীন ভারতবর্ষ ও তার অমুসলমান অধিবাসীদের নিয়ে কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা নেই। শুধুমাত্র পাকিস্তান অঞ্চল ব্যতীত ভারতের ভূখণ্ডে বসবাসকারী সাড়ে চার কোটি মুসলমানদের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, 'They are the flesh of our flesh and the soul of our soul. We can never forget them; nor they, us. Their present position and future security is, and shall ever be, a matter of great importance to us... We are not Indians; we are Pakistanis.' এক্ষেত্রে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শুধু উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে নয়, মুসলিম লিগ ভারতের পূর্ব প্রান্তেও বাঙ্গলা ও অসম নিয়ে একটি পৃথক দেশ গঠনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার নাম তখনও ঠিক করা হয়নি।

ভারতের মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনীতির পরিবর্তে ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা তাঁদের সম্প্রদায়কে তুলনায় সহজেই সঙ্ঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। ফলে কাগজে কলমে সংখ্যালঘু হলেও বেশিরভাগ সম্প্রদায়গত দর-কষাকষির ক্ষেত্রে তাঁরা তুলনায় শক্তিশালী অবস্থানে থেকেছেন। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর মুসলমান প্রতিনিধিদের পেশ করা বেশ কিছু গোপন দাবিদাওয়া জওহরলাল নেহরুর ১৯৩৮ সালে একটি পত্রালাপের মাধ্যমে পরবর্তীকালে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল (ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯৩৮, ভলিউম ১)। তার মধ্যে ছিল প্রকাশ্যে আজান দেওয়া ও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন, গোহত্যা চালু রাখা, বন্দে মাতরম্ গানকে নিষিদ্ধ করা, উর্দুকে জাতীয় ভাষা ঘোষণা এবং তেরঙা পতাকাকে বদল করার মতো ১৪ দফা দাবিদাওয়া। ১৯৩৭ সালে চালু হয় 'দ্য মুসলিম 'ল (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট। ওই বছরই কংগ্রেস বন্দেমাতরমের মূল গানটির শুধু প্রথম দুটি ছত্র রেখে বাকিটুকু বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করে। পক্ষে ছিলেন না সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্ব। বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁর হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন বইটিতে মন্তব্য করেন, 'Drop the whole song and you will find that the Moslems would demand that the very words 'Vande Mataram' are a standing insult to them!'

খিলাফত আন্দোলনে যুক্ত বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিত, দার্শনিক ও রাজনীতিক মৌলানা আজাদ সুভানি ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৯ সিলেটে তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমি চাই মুসলিম লিগের তরফে যেন ইংরেজদের সঙ্গে কোনও লড়াই না থাকে। আমাদের বড়ো লড়াই ২২ কোটি হিন্দু শত্রুর সঙ্গে। ড. আম্বেদকর তাঁর বইটিতে ভারতের মাটিতে ইসলামি রাজনীতির অভিমুখ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'Their (ie Indian Muslims') energies are directed to maintaining a constant struggle against the Hindus...Muslim politicians do not recognize secular catagories of life as the basis of their politics because to them it means the weakening of the community in its fight against the Hindus.'

ভারতের অমুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এক আকস্মিক আঘাতের সম্মুখীন হলেন ১৯৪০-এর ২৬ মার্চ। ওইদিন মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে মহম্মদ ইকবালের পেশ করা ১৯৩০ সালের প্রস্তাবটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হলো। ৪০-এর দশকে জিন্নার প্রচার করা দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রকৃত ভিত্তিই ছিল ইসলাম। সেই কারণেই মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম লিগ ভারতে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়টিকে একটি এমন পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছিল। ১৯৪০-এর মার্চ

লাহোর সম্মেলনের সভাপতি ভাষণে জিন্না বলেন, 'It is extremely difficult to appreciate why our Hidnu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religions in the strict sense of the word, but are, in fact, different and distinct social orders and it is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality and this misconception of one Indian nation has troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and litterateurs.'
স্বাভাবিকভাবেই গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামী জাতীয় কংগ্রেসের মরিয়া চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের বিভাজন ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়া আটকানো যায়নি। কারণ কয়েক শতাব্দী ধরে বসবাস করার পরেও বিধর্মীদের দেশ ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে মেনে নেওয়া কট্টরবাদী মুসলমানদের কাছে চিরকালই ইসলামবিরুদ্ধ।

১৯৪৭-এর মার্চ। মাউন্টব্যাটেন দিল্লির ভাইসরয় হয়ে আসার সময় গান্ধীজী বিহারে ছিলেন। বিহার ও নোয়াখালি তখন ভয়াবহ দাঙ্গায় দীর্ণ। জিন্না ও তাঁর মুসলমান অনুগামীরা পাকিস্তানের দাবিতে অনড়। বিভিন্ন বামপন্থী দল ও ড. আম্বেদকরও পাকিস্তানের পক্ষে। কিন্তু অবশিষ্ট ভারত দেশকে খণ্ডিত করতে রাজি নয়। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের ওপর দায়িত্ব ছিল যেভাবেই হোক ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতেই হবে। এদিকে মুসলিম লিগ কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বয়কট করেছে। এমতাবস্থায় মাউন্টব্যাটেন নিজে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার আগে গান্ধীজীর পরামর্শ চাইলেন। সকলকে অবাক করে দিয়ে গান্ধীজী দেশব্যাপী এমন ব্যাপক গণহত্যার নায়ক জিন্নাকেই অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। এক বছরও হয়নি খোদ কলকাতার বুকেই এই জিন্না'র 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনে'র প্ররোচনায় ঘটে গেছে ভয়াবহ নরসংহার, দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্। নেহরু জোরালো বিরোধিতা করলেন গান্ধীজীর প্রস্তাবের। এবং শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি বটে তবে হলে তা অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে কতখানি বিপর্যয়ী হতে পারত তা অনুমান করা কঠিন নয়।

উপরোক্ত আলোচনার অর্থ এই নয় যে, সব মুসলমানই স্বাধীনতার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বা তারা বিরোধী ছিলেন। যেমন ইন্ডিয়ান কোয়ার্টালি রেজিস্টারে (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯২৮, ভলিউম ২) দেখা যাচ্ছে ১৯২৮-এর ৪ নভেম্বর কানপুরে অল পার্টি মুসলিম কনফারেন্স (উত্তরপ্রদেশ) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষেই প্রস্তাব পাশ করে। কিন্তু খান বাহাদুর মাসুদ হাসান এবং আরও কিছু মুসলমান নেতা এর বিরোধিতা করে বলেন এমন ঘোষণা মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। অনেক পর্দানশিন মুসলমান মহিলা পর্যন্ত এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে প্রেসিডেন্ট মৌলানা শৌকত আলির কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই আলোচনার শুরুর দিকে যে প্রাণবলিদানের তালিকার কথা বলা আছে তাতে বেশ কিছু মুসলমান নামও ছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের বহু মুসলমান নেতা এক্ষেত্রে অগ্রণী দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেমন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, যাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও জোরালো পাকিস্তান- বিরোধিতা ইতিহাসে সুবিদিত। কার্যত ব্রিটিশপন্থী মুসলমান নেতাদের সঙ্গে এই সকল জাতীয়তাবাদী নেতাদেরও একই বন্ধনীতে রেখে মুসলিম লিগের রহমত আলি বলেছিলেন, 'with few honourable exceptions, the Muslem politicians are a crowd of careerists' অথচ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রায় আমৃত্যু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রীর পদে থাকা নেহরুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ এই কালামই আবার দেশভাগের জন্য উলটে হিন্দুদের দায়ী করে তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বইটিতে মন্তব্য করেছেন, 'It may be argued that if Pakistan is so much against the interest of the Muslims themselves, why should such a large section of Muslims be swept away by its lure?'

আসলে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে এই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা কাজ করেছে। প্রথমটি একক সত্তা। দ্বিতীয়টি সম্প্রদায়গত সত্তা। প্রথম সত্তাটি যাঁদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছিল তাঁরা সত্যিই বাকিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই সংগ্রামে। এই দলে শাহনাওয়াজ খানের মতো উজ্জ্বল নামও রয়েছে, যিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম কমান্ডার হিসেবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে ধরা পড়ে গান্ধীজীর প্রদর্শিত অহিংস পথে থাকার শর্তে জীবনভিক্ষা পান এবং স্বাধীনতার পর আজীবন ভারত সরকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। অবশ্য এই পদপ্রাপ্তির প্রকৃত কারণ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। যেমন নেতাজী অন্তর্ধান তদন্ত কমিশনের প্রধান হিসেবে ওই কমিটি থেকে সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র বসুর অপসারণ এবং তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীকে নিহত ঘোষণা করা। তবে সেসব অন্য প্রসঙ্গ।

বর্তমান প্রসঙ্গ হলো স্বাধীনতার সংগ্রামে মুসলমানদের সম্প্রদায়গত ভূমিকা। লক্ষ্য করা যায় বিচ্ছিন্ন কিছু দৃষ্টান্ত বাদ দিলে যেহেতু এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই ব্যক্তিগত সত্তার থেকে গোষ্ঠীগত সত্তা অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে এবং তা মূলত ধর্মীয় কারণে। ফলে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিরোধী সংঘর্ষে অংশগ্রহণের প্রশ্নে কাজ করেছিল এক পৃথক সমীকরণ। এমন এক সমীকরণ যা মুসলমান সমাজকে পারতপক্ষে দূরে সরিয়ে রেখেছিল দেশের স্বাধীনতার লড়াই থেকে। □

বাধ্যতামূলক নৈতিক আচরণবিধির দাবি হিন্দু ধর্মাচার্যদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার মঞ্চ থেকে 'বাধ্যতামূলক আচরণবিধি লাগু' বা 'কম্পালসরি এথিক্যাল কোড'-এর দাবিতে সরব হলেন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা। গত ৩ এপ্রিল আমেদাবাদের শিবানন্দ আশ্রমে আয়োজিত ধর্ম মহাসভায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা অংশগ্রহণ করেন। আমন্ত্রিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন রাও ভাগবত এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন হিন্দু ধর্মাচার্য সভার উদ্যোগে 'হিন্দু সমাজের সামনে চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক আলোচনা সভায় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও ফিল্মে সনাতন ধর্মকে বিকৃত করে দেখানো নিয়ে সরব হন ধর্মাচার্যরা। হালফিলের অনলাইন মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্টে প্রকাশ্যে যৌন দৃশ্য দেখানো হয়। অডিয়ো-ভিসুয়াল মাধ্যমে এধরনের 'বিকৃত যৌন বিষয়বস্তু ' সমাজকে অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন ধর্মাচার্যরা। সেগুলোর তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে, আইনের আওতায় তা নিয়ন্ত্রণের আর্জি জানানো হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে।

ধর্মসভায় নানা আলোচনায় হিন্দু আধ্যাত্মিক পণ্ডিত সমাজ মনে করেন হিন্দু মন্দিরগুলির অর্থ ও সম্পদ শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্যই ব্যবহার হওয়া উচিত। ধর্মসভা কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ধর্মাচার্য সভা চায়, সরকার মন্দির প্রশাসনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দূরে থাকুক। মন্দিরগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করুক স্থানীয় হিন্দু সমাজ।' যে পরিকাঠামো অনুযায়ী শতাব্দী ধরে ভারতের মন্দিরগুলি চলেছে, সেই পরিকাঠামো আবার ফিরিয়ে আনার দাবি করেছেন হিন্দু ধর্মাচার্যরা।

ন্যানো ড্যাপ কৃষকদের জীবনকে সহজ করে তুলবে

এনআইএস॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ দ্রুত সারের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। এদিক থেকে আমাদের দেশ আরেকটি সাফল্য অর্জন করেছে। ন্যানো ইউরিয়া অনুসরণ করে এখন ন্যানো ডিএপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সিদ্ধান্তকে কৃষকদের জীবন সহজ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়ার টুইটের জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মন্তব্য করেছেন। ন্যানো ডিএপির এক বোতলের কার্যকারিতা এক ব্যাগ ডিএপি সারের মতোই হবে। আগে ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড বা ইফকো গুজরাটের কালোল প্ল্যান্টে প্রতিদিন ১৫০০০০ বোতল (৫০০ মিলি) ন্যানো ইউরিয়া উৎপাদন শুরু করেছিল। ২০২১ সালের ১ আগস্ট থেকে এর বাণিজ্যিক উৎপাদনও শুরু হয়েছিল। ২০২১-২০২২ সালে দেশে ২১২ লক্ষ ন্যানো ইউরিয়ার বোতল বিক্রি হয়েছিল। শ্রীলঙ্কায় ৩.০৬ লক্ষ বোতল রপ্তানি করা হয়েছিল। ২০২২-২৩ বর্ষে (১২ ডিসেম্বর, ২০২২) দেশে ২০১ লক্ষ ন্যানো ইউরিয়ার বোতল বিক্রি হয়েছিল, যেখানে নেপালে ০.৬ লক্ষ বোতল রপ্তানি করা হয়েছিল। এক বোতল ন্যানো ইউরিয়ার দাম ২২৫ টাকা।

আবেদন

'শত সহস্র নারী এবং পুরুষ পবিত্রতার উদ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে, ঈশ্বরের প্রতি চিরন্তন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এবং সিংহের তেজে তেজবান হয়ে দরিদ্র পতিত এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য সহানুভূতি নিয়ে মাতৃভূমির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বরাবর ছড়িয়ে পড়বেন। প্রচার করবেন পরিত্রাণের বাণী, সাহায্যের বাণী, সামাজিক উন্নয়নের বাণী এবং সাম্যের বাণী।'

— ***স্বামী বিবেকানন্দ***

এক আহ্বান

- বিবেকানন্দ কেন্দ্রে দুই বৎসর বা তার বেশি সময়ের জন্যে সেবাব্রতী হিসাবে যুক্ত হোন
- আপনি আপনার দেশবাসীকে ভালোবাসেন এবং তাদের জন্য কিছু করতে চান। সেই কারণে দুই বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য বিবেকানন্দ কেন্দ্রে সেবাব্রতী হিসেবে যুক্ত হতে পারেন।
- বিবেকানন্দ কেন্দ্র হলো এমন এক সংস্থা যার ভিত্তি হলো আধ্যাত্মিকতা। সারা দেশে এই কেন্দ্রের ৮৩০টি শাখা রয়েছে।
- এখানে একজন সেবাব্রতীকে তাঁর মৌলিক চাহিদা এবং কাজের জন্য একটি সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁর নিজেকে বহন করার জন্য কর্মদক্ষতা এবং যোগ্যতা থাকতে হবে।
- যদি স্বামীজীর বাণী আপনার মধ্যে দেশমাতৃকার জন্য কোনো ভাবনার সৃষ্টি করে এবং আপনি ভারতমাতার উন্নতির জন্য কিছু করতে চান, তবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার আহ্বান জানাই।

——— যোগাযোগ ———

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কলকাতা

৭৬/২, বিধান সরণি, ফ্ল্যাট এক্স-৩, দ্বিতীয় তল

(স্টার থিয়েটারের সন্নিকটে)

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

ফোন - ৯১ ৯৪২০০২৩১৭৫

ই-মেইল : kolkata@vkendra-org

Advt.

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৪০।।

আমেরিকার মিউজিয়ামে মহানামব্রতজী অজস্র ভাস্কর্য ও মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ালেন হাত পেতে বসা একটি গোপালের কাছে। ভাবলেন, এত ঐশ্বর্য, এত প্রাচুর্যের মহাদেশে ভালোবাসার কাঙাল ঠাকুর গোপালের হাতে মা যশোদার স্নেহ বাৎসল্যের নাড়ু দেবার কেউ নেই। এখানে সব আছে, শুধু হৃদয় নেই।

*১৯৩৬ সালে **World Fellowship of Faiths** -এর উদ্যোগে লন্ডনে অনুষ্ঠিত **World Congress of Faiths**-এর সভায় আন্তর্জাতিক সম্পাদক হিসাবে মহানামব্রতজী স্বাগত ভাষণ দেন। ওই সভায় বিশ্বের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী ড: রাধাকৃষ্ণন।* *(ক্রমশ)*